প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩০

১৪৩০ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : নববর্ষ সংখ্যা : 2023

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
৺সোমা ঘোষ স্মরণে		3-13
গদ্য		
মোদের গরব মোদের আশা	রূপসা সরকার (হিউস্টন, টেক্সাস)	15
বর্ষবরণ	জয়শ্রী বাগচী (দিল্লী, ভারত)	16
এল নতুন প্রভাত	অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস (চ্যান্ডলার, অ্যারিজোনা)	17
সিস্টার নিবেদিতা এবং মাজননী	শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	18
বদলা	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	20
রবীন্দ্রনাথের গান ও গানের অন্তরালে	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	23
বাঙালি সমাজের দুঃখজনক কর্মকাণ্ড	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	27
মুণ্ডাজোড়া ম্যাঙ্গানিজ মাইনস	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	29
প্রগ্রতিশীল প্রযুক্তি বনাম পারিবারিক সম্পর্ক	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	34
নিজেকে জানা একটি জরুরি ভাবনা	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	39
আ মরি বাংলাভাষা	৺সোমা ঘোষ	43
খাদির চাদর	রবীন বসু (কলকাতা, ভারত)	44
গল্পের নাম পর্ব দুই	নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	61
হলুদ ফিতে	চিত্ত ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	63
ফাটল, অবিচার, অতীতের জানালা	অনুবাদ: বেবী কারফরমা (কলকাতা, ভারত)	65, 66
মানুষ ও আমি	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	67
প্রিয়নাথের অভিযোগ	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	69
আলাদা	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	76
অভিনয়	অদিতি ঘোষদস্তিদার (মরিস প্লেইনস্, নিউ জার্সি)	80
পাজামা বনাম নাইটি	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	83
আত্মগরিমা	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	85
এক টুকরো স্বপ্ন	অর্পিতা ঘোষ পালিত (কলকাতা, ভারত)	87
শ্রী নারায়ণ সাহেব	রুমকি দাশগুপ্ত (হিউস্টন, টেক্সাস)	88
লেকের ধার	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	93
পড়ন্ত বেলার কাব্য	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	94
মাটির টান	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	96
কবিতা		
নতুন বছর আসে	মিলি দাস (কলকাতা, ভারত)	47
মনসঙ্গীত ১, ২, ৩	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	47, 60
আজও বহমান, অপেক্ষা	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা,ভারত)	48, 50
মহাসমুদ্রের রংধনু সেতু, মরণ অবধি বেঁচে থাকা	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	49, 60
বসন্ত এল, কবে বলব	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	51
ভালবাসা ছিল, আমার যুদ্ধ	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	52
অন্ধকার যাত্রা	দীপশিখা চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	53
অলীক	ব্রতী ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	54
আগুনে পাখি	নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	54
উপেক্ষায়	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	55
ঐ অন্তহীন নীল বুকে	নার্গিস পারভিন (মুম্বাই, ভারত)	55
এসো হে বৈশাখ	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	56
হৃদয় প্রস্তর, চিঠি	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	57, 58
প্রেমাধার	শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	59

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩০, এপ্রিল ২০২৩

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র:

সৃষ্টি দত্ত (বয়স ১৫)

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

আমরা সব সময়ই চাই পরের প্রজন্মের নানারকম কৃতিত্ব উপভোগ করতে এবং জনসমক্ষে তুলে ধরতে। আমি হিউস্টনে যাবার পর থেকে অনেকবার প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অসিতদাকে বাঙালি সমাজের ছোটদের লেখা প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় দেবার অনুরোধ জানাতে শুনেছি। কিন্তু নানা কারণে সেটা সম্ভব হয়নি – সেজন্য আমি ঠিক করেছিলাম যে যেহেতু ওদের লেখা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে প্রবাস বন্ধুর প্রচ্ছদ চিত্র রাখব হিউস্টন বাঙালি সমাজের অত্যন্ত গুণী ছোটদের আঁকা ছবি দিয়ে। সেইরকমই চলছিল; হঠাৎ এবার হিউস্টন দুর্গাবাড়ির স্কুল, কলাভবনের শিক্ষিকা, রূপছন্দা তার এক ছাত্রী, রূপসা সরকারের হাতে লেখা একটি সুন্দর, মনকাড়া প্রবন্ধ পাঠিয়ে সবার আগে আমার মনটাই কেড়ে নিল।
রূপসার বয়স ১২ বছর; সে রূপক আর শ্বেতা সরকারের কন্যা।
আশা রাখব এবার থেকে আরও অনেক ছোট বন্ধুরা প্রবাস বন্ধুর পাতায় যোগ দেবে।
ছোটদের কতরকম ব্যস্ততার মধ্যেও ওরা সপ্তাহ শেষে দুর্গাবাড়িতে যায় বাংলাভাষা, ভারতীয় নাচ-গান, ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখতে। এছাড়াও তারা ভারতীয় খেলাধুলো যেমন – ফুটবল ও ক্রিকেটের মর্যাদাও বজায় রেখে চলেছে। সাংস্কৃতিক ধারা এমনভাবে বজায় রাখতে পারে তারাই, যারা শিখতে এবং একাধারে শেখাতে ইচ্ছুক। এইসব উৎসাহী মানুষদের জন্য রইল আমাদের বিশেষ অভিনন্দন।
এই সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকেছে সৃষ্টি দত্ত (বয়স ১৫)। হিউস্টনের বাঙালি পরিবার, রাজীব ও চন্দ্রানী দত্তর মেয়ে সৃষ্টি।
এই সংখ্যার দুজন ছোট বন্ধু, রূপসা এবং সৃষ্টিকে পত্রিকার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই।

এইসবের বাইরে জগতের আর দিকগুলো দেখতে গিয়ে মন হোঁচট খায় পদে পদে। অসামাজিকতাই যেন সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। আমরা, বয়োজ্যেষ্ঠরা কোনভাবেই যখন অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনতে সক্ষম হচ্ছি না, তখন ভরসা রাখব পর-প্রজন্মের উদীয়মান নক্ষত্রদের সুপরিকল্পিত ও মর্যাদাপূর্ণ ভাবধারায়।
কালে কালে তেমনই ঘটে চলে – উত্থান-পতনের নাগরদোলা চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে। শুধু আশা এই যে, পতনের গভীরতা যেন এমন না হয়, যাতে একেবারে ছরকট ঘটে যায়। উত্থান বেশি হলে পতনের ধাক্কাও ভারী হবে বলা বাহুল্য।

দুঃখের সঙ্গে জানাই – প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের একজন সদস্য শ্রীমতী সোমা ঘোষ সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছে। সোমার পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।
এই সংখ্যায় আমরা তাকে ঘিরে কিছু স্মৃতিচারণ রাখলাম।
পত্রিকায় সকল অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা রইল।
বাংলা নতুন বছর সকলের জীবনে শুভ হোক।

মালবিকা চ্যাটার্জী

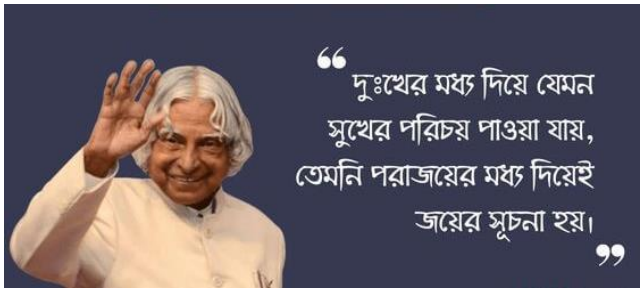

পত্রিকায় অনুল্লেখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত~

সোমা ঘোষ

স্মরণে

সোমা ঘোষ

জুলাই ২৮, ১৯৭৫ – ডিসেম্বর ১৪, ২০২২

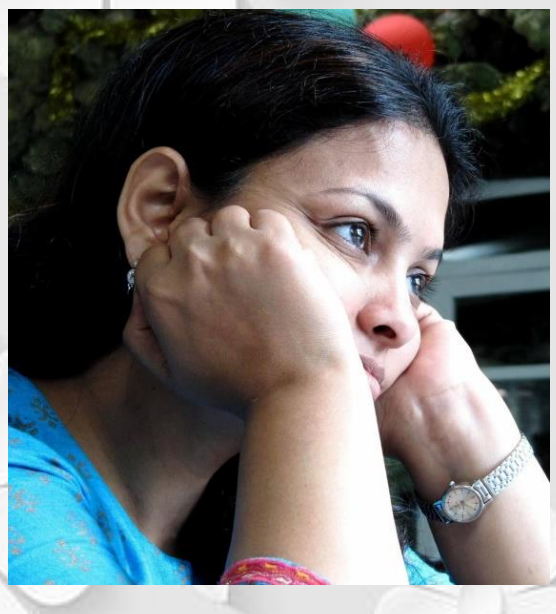

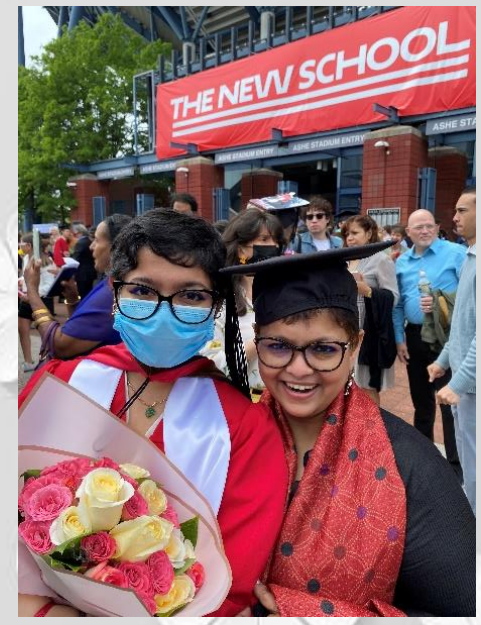

My Wife

By Sukanti Ghosh

Today is Poila Baisakh or New Year's Day for the Bengali community around the world. 25 years ago today, Soma and I were married in a simple ceremony in Kolkata, with some close friends and intimate family members in attendance. In true Hollywood style, Soma and I had only met 22-days ago, but that's all it took for the two of us to decide that we had met the one person who would complete our lives forever, and our parents - at both ends - were happy to extend their blessings despite my being in transition at the time. Today, four months to this very day,

Soma left us for her heavenly abode after a six and half year long battle with cancer, a battle that saw us change countries, jobs, doctors, hospitals, and saw Soma undergo six relapses and take well over 50-rounds of chemotherapy. Surprisingly, very few people ever saw Soma's smile leave her lips despite the hardships associated with this journey, or the twinkle in her eye ever fade. On the contrary, she taught us -my daughter and I - how to live life to the fullest in the face of all the curveballs that life throws at you, and how to count your blessings at all times. We surely do. I am indeed fortunate that Soma chose to spend her life with me. I am equally fortunate that I came across some exemplary leaders in two visionary organisations - **APCO Worldwide** and the erstwhile **Albright Stonebridge Group** - who made it possible for me to continue to provide Soma with the best cancer treatment in the world. To that end, I will always be truly grateful. As we will be forever indebted to the amazing doctors at **MD Anderson Cancer Center** who made initial 'less than six months' prognosis turn to six and half years. Soma and I had hoped to renew our vows today. Our silver wedding anniversary. And, while we won't be able to head to Hawaii (as she had hoped) or to Las Vegas, as I had suggested, at least I can take refuge in the fact that she is and will always be with me in spirit. Today and forever. Today, also marks the month and a half long mark that I stepped away from work to pick up the pieces of our lives and to think through what I want to do next. As I reflect on some of the answers that have risen to the surface as the tumultuous waters have settled, I feel a sense of calm and renewed responsibility. Personally, I hope to share our insights with those who currently find themselves on this incredibly difficult

journey. A TEDx talk - focused on the importance of sensitive and supportive caregiving for terminal cancer parents is in the offing; a book perhaps, on the importance of organizations that truly care; and, even counselling caregivers on the 'Caregivers Curse'. All these strands will celebrate Soma - her life, a life well lived; her indomitable spirit; and, our time together as a family, even as I take meaningful steps toward my next personal and professional journey. Happy Anniversary M. May you continue to spread the light wherever you may be. Yours truly, N. **Sanjana Ghosh**

সোমাকে

উদ্দালক ভরদ্বাজ

তোমাকে তো ভাল করে জানাই হ'ল না। সুযোগ হয়নি। মাঝে মাঝে সাহিত্য সভায়, মাঝে মাঝে ফেসবুকে, অথচ তোমার চলে যাওয়ার কষ্ট, একটা অদ্ভুত শূন্যতা এনে দিচ্ছে প্রতিদিন। কী যেন জানতাম তোমার সম্বন্ধে, কী করে যেন চিনতাম তোমায়।

চন্দ্রাদির বাড়িতে জানালার পাশের চেয়ারটায় আমি বসেছিলাম। তুমি পাশের চেয়ারটায় বসতে এসে বললে – "তোমার পাশে বসলে অসুবিধা নেই তো?" তারপর বসে বললে, "তোমাকে তুমি বললাম, অসুবিধা নেই তো?" সেদিনই মনে হয়েছিল তুমি অন্যরকম...

আমি জানি না, শরীর ছেড়ে যাওয়ার পর আত্মা কোথায় যায়। যে কোনও ভারতবর্ষীয় মানুষের মতো একটা ধোঁয়াটে ভাবনা আছে, কিন্তু যেহেতু প্রামাণ্য কিছু নেই, তাই জানি না, কোথায় আছ। শুধু জানি, তুমি যেই হও, যেখানেই থাকো, আবার আসবে তুমি। এ পৃথিবীর মায়া এবারেই কাটবে না; আমারও না, তোমারও না। হয়তো তোমার সঙ্গে কোনদিন দেখা হবে না আর। অথবা হবে, চিনতে পারব না। কিম্বা চিনে নেব। মনে হবে – হয় অল্প চিনেছিলাম তোমায়, তেমনি চেনা হবে হয়তো...

বৃষ্টিভেজা গোলাপি ফুলেভরা রেডবাড গাছটার ছবির নিচে দু লাইন লিখেছিলাম আমি –

তুমি এই গাছের নিচে বসো,
বৃষ্টি এসে ঝরুক তোমার হাতে
হঠাৎ যদি শিহর লাগে জেনো
একফোঁটা মন ছুঁইয়েছিলাম তাতে।

তুমি সেই ছবি আর কবিতার পোস্টটা আমায় দিয়ে পাবলিক করিয়ে, শেয়ার করে বলেছিলে, "উদ্দালক তোমার কিছু কবিতা শেয়ার না করলে আমাদের পাপ হবে।" আমি আবার চমকে গেছিলাম। তুমি তো নিজগুণে সম্পন্ন লেখিকা, সম্পূর্ণও। বেশি পড়িনি তোমার ব্লগগুলি; কিন্তু যেটুকু তোমার লেখা পড়েছি, তোমায় জেনেছি, মনে হয়েছে স্পষ্ট বক্তা তুমি। সোজা কথা সোজা করে বলে দিতে পারো। অজানা অচেনা কবির কবিতা ভাল লাগলে সকলকে জানানোর এই ইচ্ছাকে আবার কুর্নিশ জানালাম।

আমার আর একটি কবিতা, 'মুক্তি' তোমার খুব ভাল লেগেছিল, তুমি শেয়ার করে বলেছিলে, "perfect words. I just added a photograph to the words" ভাবলাম, সেই কবিতাটা আজ তোমায় শোনাই –

মুক্তি

মুক্তির শুশ্রূষা দিও।
আমার ক্লান্ত মন
তোমার রক্তাভ আঙ্গুল ছুঁয়ে
দু'দন্ড জিরিয়ে নেবে;
এ ছাড়া চাওয়ার মতো
কিছু নেই আর।

সময়-নিংড়ানো সাধ,
তীব্র সুখ, এখন অসম্ভব,
বা হয়তো নয় –
তবুও বৃষ্টিস্নাত
চার্ণক নগরীর গায়ে
উড়ে এসে বসে
নষ্ট প্রজাপতি।

ভিজে রেলিং,
আবছায়া ট্যাক্সির নির্জনে
মন-ভরে-যাওয়া ক্লান্ত মানুষ
লিখে রাখে ভালবাসার দলিল –
একদিন পুড়িয়ে দেবে বলে।"

সারা পৃথিবী ঘুরেছ তুমি, তবু কলকাতা তোমার প্রাণের শহর ছিল বোধ হয়। এই কবিতাটিও কলকাতা প্রসঙ্গে। তারাপদ রায়ের কবিতা প্রসঙ্গে একদিন তুমি এই পোস্টটি করেছিলে। সেখানেও কলকাতার কথাই রয়েছে। তোমার ভাষায় একটুখানি তোমার কথা, ভাবলাম সবাই শুনুক...

"এতদিন তারাপদ রায়ের তির্যক ব্যঙ্গাত্মক নানা প্রবন্ধ, তাঁর ছোট গল্প, উপন্যাস রম্যরচনাগুলোর কথাই জানতাম, ভালবেসে পড়তাম। তারপর কয়েক বছর আগে আমার কবি বন্ধু Uddalak-এর কাছে শুনলাম তারাপদ রায়ের কবিতার কথা। আমি বরাবর কবিতা/পদ্যের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলি, কবিতা বেশি বুঝি না – আমার জীবন গদ্যময়। কিন্তু তারাপদ রায়ের কিছু কবিতা বড্ড ভাল লাগে, তার মধ্যে একটি" –

কলকাতায়

সরিয়ে নিয়ো না হাত থাকো ছুঁয়ে
কলকাতায়, বিদেশ-বিভূঁয়ে
যতক্ষণ কাছাকাছি থাকা যায়।
কাঠবাঙালের কাছে হাইকোর্ট এখনো তেমনি
গোল থাম, থমথমে লাল বাড়ি
পথে যেতে রাতারাতি বাতি ও রমণী
রয়ে গেলো অবুঝ, অচেনা।
হাত ধরে তুমি চেনালে না
তোমার শহর, বাড়িঘর।
শুধু থাকো যতক্ষণ পারো হাত ছুঁয়ে,
যতক্ষণ কাছাকাছি থাকা যায়, কলকাতায়, বিদেশ বিভূঁয়ে।

প্রবাস বন্ধুকে তুমি খুব ভালবাসতে। বলেছ আমাকে অনেকবার। স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ কতগুলি সৃষ্টিশীল মানুষের এই একত্র হওয়া তোমাকে খুব গভীরে ছুঁয়েছিল। তাই অজস্র অসুবিধা, শারীরিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তুমি আসতে, এবং সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে। আমিও করতাম সে সময়ে। এবং করতাম বলেই তোমার সঙ্গে পরিচয়। সে কারণেই সভার সকলেরও তোমার সঙ্গে পরিচয় ও ভালবাসা। আমাদের সভা এমনি থাকুক এই প্রার্থনা ও শপথ করি আজ তোমার কাছে। অনেকদিন আমিও নানা কারণে তেমনভাবে যোগদান করতে পারিনি। আজ অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম, করব এবার থেকে।

সত্যি বলি, এক সময়ে ভাবতাম, প্রবাস বন্ধুর বাইরে, তুমি বোধহয় সভা মজলিশ বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রয়াস এড়িয়ে যাও কোনও কারণে। তারপর জেনেছিলাম তোমার ব্যক্তিগত শোক এবং শারীরিক প্রতিকূলতা, সেও এক কারণ। আজ মনে হয় তুমি সাধারণভাবে অপূর্ব কথকী হলেও তুমি আসলে আপন মনের মানুষ। Introvert কথাটার মধ্যে একটা লুকিয়ে থাকা আছে। সে তুমি কখনই নও। কিন্তু মানুষের ভীড়ের মধ্যে থেকে যে নিজের পাশে এসে বসতে পারে, তার প্রতি, তাদের প্রতি বোধহয় আমার একটা সহজাত ভালবাসা, একটা ভাল লাগা আছে। তোমার সঙ্গে অপরিচয়ের দুঃখ তো থেকেই যাবে, কিন্তু ভাবলাম এই অল্প ভাল লাগাটুকু, এই অজানা, অন্যরকম ভালবাসাটুকু তোমায় জানিয়ে যাই।

তারাপদবাবুর কবিতা তোমার ভাল লাগে বলে ২০১৯ সালে একটি কবিতা পোস্ট করে তোমায় tag করেছিলাম। তুমি সেই পোস্টের নিচে লিখেছিলে - "উদ্দালক, কথা হারিয়ে ফেলছি। তারাপদ রায় কত বছর আগে আমার মনের ব্যথা পড়ে আমার মনের কথা লিখে গেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ!" আজ সময় কম তবু তোমায় পড়ে শোনাতে সাধ হ'ল সেই কবিতাটিও।

সমবয়সিনী

তুমি এই মাধবীলতার প্রায় সমবয়সিনী।
আষাঢ়ে তোমার জন্ম, শ্রাবণে যমুনা
এই মাধবীর চারালতা উপহার দিয়েছিল।
সেই চারা বৎসরে বৎসরে,
বৃষ্টি, জলে, স্বপ্নে ও জ্যোৎস্নায়
আমাদের পুরনো বাড়িতে বহু শুভ্রতার স্মৃতি
অমল ধবল পাল তুলে নৌকোর মতন বাসাবাড়ি
অনেক উজান ভাঁটা পারাপার হলো।

মাধবীর ফুল ফুটলে এখনো যমুনা নামের একটি মেয়েকে,
কোমরে জড়ানো শাড়ি, রুক্ষ চুল স্পষ্ট দেখতে পাই;
তুমি যমুনার মত নও, তুমি যমুনাকে
কখনো দেখোনি, তুমি শুধু বারো বছরের
বৃষ্টি, জলে, স্বপ্নে ও জ্যোৎস্নায়,
মাধবীলতার সমবয়সিনী আরেক মাধবী;
হঠাৎ সকালবেলা ফুটে উঠে, 'বাচ্চু, বাচ্চু' বলে
খেলার সঙ্গীকে ডাক দাও।

তোমার নামটি খুব সাধারণ। বাঙালির ঘরে ঘরে সোমা নামের অজস্র মেয়ের সংস্পর্শে আমরা সকলেই এসেছি আমাদের জীবনে। কিন্তু তুমি সাধারণের চেয়ে আলাদা ছিলে। তোমার জীবনের গভীর, গভীরতর শোক, তোমার শরীরের ক্লিষ্টতা তোমার মুখ থেকে তোমার হাসি, তোমার মধুর ব্যবহার এবং সর্বোপরি তোমার কৌতুকবোধ কখনও কেড়ে নিতে পারেনি। তোমাকে না-জানার দুঃখ তো রয়েই যাবে, কিন্তু ভাবলাম, তোমার এই সহজ খুশির মনকে ক্ষণিকের জন্যে ছুঁয়ে যাওয়ার আনন্দটুকু তোমায় জানিয়ে যাই। তোমার চলে যাওয়ার এই শূন্যতাটুকু বাঁশির মতো বেজে আমাদের সারাজীবন মনে করাবে তোমার কথা, তোমার হাসির কথা, তোমার চরিত্রের স্পষ্টতার কথা। এটুকুই থাক আজ কথা, এটুকুই...

পুনঃ ওরা হিউস্টনে পৌঁছানোর কয়েক মাসের মধ্যেই সাহিত্য সভার একটি অনুষ্ঠানে প্রথম দেখা হয়েছিল সোমার সঙ্গে। তারপর কয়েক বছর ধরে সাক্ষাতের সংখ্যা সীমিতই ছিল আমাদের। তবু সোমার চলে যাওয়া একটি শূন্যতা রেখে গেছে, যা থেকে যাবে আমাদের হৃদয়ে। কিন্তু আমরা জানি, একদিন সেই শূন্যতা, সোমাই আবার ভরে দেবে তার চিরচঞ্চল চোখ, সদাহাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী, বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকের ছটায়, জীবনকে ভরপুর ভালবাসার মন্ত্রে, জীবনের সবটুকু সহজে গ্রহণ করার শিক্ষায়। মারণ ক্যান্সার সারাতে সোমা এসেছিল আমাদের শহরে। আমাদের সকলের মন সারিয়ে চলে গেল।
ওর স্মরণ সভায় পড়ব বলে এই লেখাটুকু লিখেছিলাম, আমাদের সীমিত সাক্ষাত এবং বিনিময়ের দলিল হিসেবে সেটুকু মনে হ'ল, থেকে যাক না, আমাদের ভালবাসার পত্রিকায়, সোমার ভাললাগা প্রবাস বন্ধুর এই সংখ্যায়।

সোমা ঘোষ

ভজেন্দ্র বর্মন

যখন সোমা ঘোষের অসুস্থ থাকার কথা জেনেছি, তখন বিশ্বাস করতে পারিনি যে এত কম বয়সে উৎসাহী এবং হাস্যোজ্জ্বল মানুষটি এমন এক কঠিন রোগে ভুগতে পারে। তার সুন্দর এবং মার্জিত কথাবার্তার মাঝে সব সময় একটি সবল ও সুস্থ মানুষের প্রকাশ পেয়েছিল। আমি খুব খুশী হয়েছিলাম যখন শুনেছি তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

তার মৃত্যুর (১৪ ডিসেম্বর, ২০২২) কয়েক সপ্তাহ আগে এক বিকেলবেলায় তার সাথে দুর্গাবাড়িতে আমার দেখা হয়। আমাকে সে পিছন থেকে সম্বোধন করে। ডাক শোনার পর বুঝেছিলাম সোমা ডাকছে। এখন আমার দুঃখ হয় কেন আমি তাকে তার ডাকার আগে চিনতে পারিনি। তার মাথাঢাকা অবস্থা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তার অসুখ আবার বেড়েছে। তাকে কেমন আছ জিজ্ঞেস করাতে সে যথারীতি উত্তর দিয়েছিল, "আমি ভাল আছি।" আমার ধারণা, খুব কম সংখ্যক মানুষ সোমার মতো জীবনকে সহজভাবে দেখে ও নির্বিকার থাকতে পারে।

সোমার আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভোলা কী যায় তারে

কমলপ্রিয়া রায়

মনে পড়ে তার লেখা
মনে পড়ে তার হাসিমুখ
মনে পড়ে তার অভিনয়
যে সয়েছে সব কষ্ট দুখ

যে লেখিকা এসেছিল কাছে
তার সব গুণটুকু নিয়ে
যে ছিল সাহিত্যসভায়
কনিষ্ঠতমা সঞ্জীবন মেয়ে

সে চলে গেল বড় তাড়াতাড়ি
আমাদের সবাইকে ছেড়ে
সে চলে গেল তোমারি আশ্রয়ে
দয়াময়, পরম শান্তির নীড়ে

সোমা, তুমি আছ আমাদেরই মাঝে
কোনোদিন ভুলব না তোমারে
তোমার স্মৃতি হবে না তো মলিন
ফিরে আসবে সবার মাঝারে।

আমার চেনা সোমা

মালবিকা চ্যাটার্জী

সোমা, তোমাকে আরো ভাল করে চেনার আগেই আমরা টেক্সাস ছেড়ে চলে এলাম; আর তুমি তার এক বছরের মধ্যেই চলে গেলে আরো অনেক দূরে। কিন্তু তবু মনে হয় তোমাকে আর বেশি কীই বা চিনতাম, তুমি তো প্রথম থেকেই কোনো আগল রাখোনি নিজের সম্পূর্ণ সত্তা মেলে ধরতে। তোমার ওই নিপাট দিলদরিয়া আকর্ষণী ক্ষমতায় তুমি সকলকেই কাছে টেনে নিয়েছিলে অনায়াসে।
সোমা এমনই একজন মানুষ, যাকে ভালবাসা যায় সহজেই।
সবার সঙ্গেই ওর একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠত। সবরকম অবস্থার মধ্যেও ওর মতো প্রাণবন্ত, সদাহাস্য একটি ব্যক্তিত্ব সত্যিই বিরল। এমন সুন্দর একজন মানুষের এত তাড়াতাড়ি সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা খুবই মর্মান্তিক। সোমার ওই কঠিন অসুস্থতা কোনদিনও কোনও সম্পর্কে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। সোমা আমাদের শিখিয়ে গেছে প্রতিকূল অবস্থাতেও কীভাবে শান্ত, সমাহিত হয়ে জীবন সহজ করে তোলা যায়।
সোমা এক সুন্দর অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে আমাদের মনের অলিন্দে।
ওর কাছের মানুষরা, সুকান্তি, ওদের মেয়ে, সোমার মা-বাবা – সকলের অসহায়তা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সেই সঙ্গে সোমার জীবনের উচ্ছলতা তাদের জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।
সোমা, তোমার চিরশান্তি কামনা করি।

সোমা

নীতা শেটকর

সোমা – উচ্ছল, প্রাণবন্ত আর ততটাই হাল খবর নিয়ে চিন্তিত আর মুখর। মৃণালদা এক সাহিত্য সভায় নিয়ে এলেন ওকে। সবার সাথে এক নিমেষে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

লেখালেখির জগতে উজ্জ্বল, আবার হিন্দি সিনেমাতেও ততটাই আগ্রহ! এদিকে শাড়ি গয়নাতেও উৎসাহ। আমার থেকে খানিকটা ছোট তবে ব্যক্তিত্ব খুব প্রখর তাই বয়সের ব্যবধান বন্ধুত্বের প্রতিবন্ধক হ'ল না।

সাহিত্য সভার বাইরেও আমাদের বেশ একটা সম্বন্ধ তৈরি হয়েছিল – নতুন রেসিপি থেকে, নতুন বই বা সিনেমা নিয়ে আড্ডা – সবেতেই ওর অবাধ বিচরণ। কখনো নিজের অসুখের ব্যাপারে কোনও অভিযোগ শুনিনি। তবে ওর বোনের ব্যাপারে মনে একটা দুঃখ ছিল – খুব আপনজনকে হারাবার যে কষ্ট, সেটা ওকে মাঝে মাঝেই খুব হতাশ করে দিত। হয়তো নিজের দিনগুলো হাতে গোনা জানত বলে বা নিজের স্বভাবের বশেই – সব সময় মনের কথা অকপটে বলতে দ্বিধা করত না । সাংবাদিক ছিল, তাই মানুষকে নিরীক্ষণ করত খুব খুঁটিয়ে, আর ওর এই বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল খুব তীক্ষ্ণ!

খুব মজা করে সেইসব গল্প বলতে পারত।

সোমাকে ওর চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সাবলীল ব্যক্তিত্বের জন্যে মনে রাখব। মনে রাখব ওর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে প্রাণখোলা হাসির জন্যে। একটা দমকা হাওয়ার মতো এসে আমাদের জীবন আনন্দে ভরে দিয়ে গেছে ও। সোমা যেখানেই থাক, ভালো আছে – এটাই আমার বিশ্বাস!

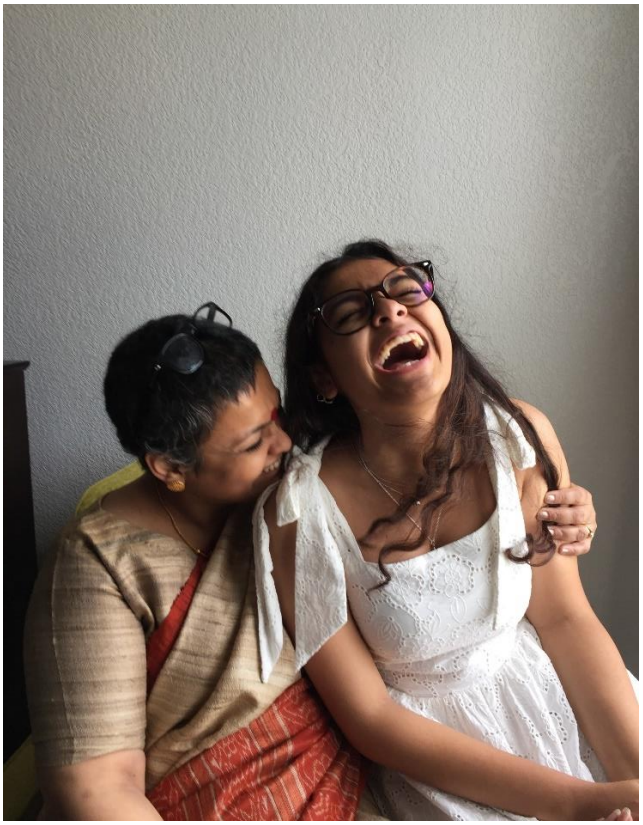

নববর্ষ সংখ্যা

আমাদের গরব, আমাদের আশা

রূপসা সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণী

বাংলা আমার মাতৃভাষা। এটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম মধুর ভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম দিয়ে।

আমার জন্ম আমেরিকায়, আমি হিউস্টনের দুর্গাবাড়ির কলাভবনে বাংলা শিখি। আমি বাংলায় লিখতে, পড়তে আর কথা বলতে পারি। আমি বাংলা আবৃত্তি অনুষ্ঠান এবং নাটকে ও সংশগ্রহণ করি। এগুলো আমাকে খুব আনন্দ দেয়।

যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলি' লিখেছেন এবং নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন, সেই ভাষায় কথা বলতে পেরে আমি গর্বিত।

বর্ষবরণ

জয়শ্রী বাগচী

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হ'ল সমাপন।

তবু ঠিক যেমনটি তেমন...

চৈত্র পবনের শেষ পরশটুকু গায়ে মেখে ঝরাপাতার দল এখনও খসে পড়ছে এখানে-ওখানে, যেখানে-সেখানে – ঠিক আগের মতোই।

ঝোপেঝাড়ে পাতার ফাঁকে লুকিয়ে থেকে কোকিল তার সঙ্গিনীকে খুঁজেই চলেছে; ওদের ওই বিরামহীন ডাকে একটু যেন হতাশাভরা কারুণ্যের সুর।

শেষ বসন্তের উদাসী হাওয়ায় আম মুকুলের গন্ধ হয়তো ফুরিয়ে এসেছে, তবু ওই মন-কেমনের সুর মাখানো নিমফুলের নির্যাস নিতে নিতেই চৈত্রের বিদায় আর বৈশাখের অনুপ্রবেশ।

বাংলা বছরের আরো এক জন্মদিন, অজানার পথে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়া।

বছরের পর বছরের এ এক অন্তহীন চলা! এক বিরাম-বিহীন এগিয়ে যাওয়া, যার হয়তো স্থির কোনো লক্ষ্য নেই, নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যও নেই – শুধু যাওয়া আর যাওয়া, এক নেশায় মেতে এগিয়ে চলা।

এই উদ্দেশ্যহীন এগিয়ে চলাকে শুধু বাঙালি নয়, সারা ভুবন জুড়ে আমরা সবাই, পুরাতনকে সাথে নিয়েই এক নতুন আশার বাঁধনে বেঁধে বরণ করি, যেন একদিন এই নিরাময় পৃথিবীকে শান্তির বারিধারায় সিক্ত করে তুলতে সফল হতে পারি।

এল নতুন প্রভাত

অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

চাষ-আবাদ ও আরো অনেক ঋতুনির্ভর কাজের সুবিধের জন্য সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সৌর বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করেন। ৯৬৩ হিজরী সালের মহরম মাস ছিল বাংলার বৈশাখ মাস, এজন্য বৈশাখ মাসই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জীর প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়। চৈত্র মাস অবধি প্রজাদের খাজনা শোধ উপলক্ষ্যে জমিদার ও ব্যবসায়ীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। চৈত্র শেষে গ্রামের মেয়ে-বৌ ঘরবাড়ি-উঠোন ঝকঝকে পরিষ্কার করে অপেক্ষা করত এই নতুন আনন্দ উৎসবের। পুরনো বছরের হিসেব-নিকেষ চুকিয়ে লাল সালু কাপড়ে মোড়ানো নতুন হিসাবখাতার শুরুটিই 'হালখাতা' অনুষ্ঠানের প্রবর্তক।

যাকগে, এ তো গেল ইতিহাসের কথা – ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নতুন বছর আসে বিভিন্ন সাজে, নানা রঙের মোড়কে। মহারাষ্ট্রের গুড়ি-পারবা, পঞ্জাবের বৈশাখী, অসমের বিহু বা দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে উগাদি – আরো কতরকম নাম ও সম্বৎসর উদ্‌যাপনের খুশিতে ঝলমল মুহূর্ত, তবে সবই যেন গোলাভরা ধান আর কৃষকের ঘরে উপচে পড়া পরিতৃপ্তির আশ্বাস। আজও যদি নববর্ষের একই প্রাণোচ্ছলতা ধরে রাখতে হয়, তাহলে সবার আগে সেই আশ্বাস জিইয়ে রাখতে হবে।

ওপার বাংলার 'পহেলা বৈশাখ' হোক বা এপার বাংলার 'নববর্ষ' – শহরে, গ্রামে, পাড়ার গলিতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে –

"এসো হে বৈশাখ,
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।"

সকালে দূরদর্শনে পঙ্কজ সাহার নামী-গুণী শিল্পীদের সেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান 'নববর্ষের বৈঠক' আজও আমাদের মনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে ছোট্ট থেকেই দাদা-দিদিদের সাথে প্রভাতফেরির মিছিলে ঘুরে ঘুরে নাচ-গানের মিষ্টি মুহূর্তগুলো কোনদিনও ভোলার নয়। আর ছিল নতুন সুতির কাপড়ে বানানো ফ্রিল দেওয়া ফ্রক, তার ওপরে মা সুতোর কাজে এঁকে দিত ফুল-লতাপাতা-পাখি; আর বলত, "চাঁদিফাটা গরমকাল আসছে, এই সুতির ছিটের জামাতেই আরাম পাবি।" নববর্ষে কিন্তু কার কটা জামা হ'ল সেই আড়ম্বর ছিল না, বরং ছিল পাড়ার দর্জিকাকুর বানানো জামায় নাম না হওয়া স্নেহের বাঁধন, ছিল মায়ের শীতল হাতের স্পর্শ। পাড়ার কাকিমা-জেঠিমারা ভোর হলেই গঙ্গাস্নান করে এসে দুয়ারে খড়িমাটির আলপনা দিত; মাটির বা কাঁসার ঘটে জল ভরে তাতে কচি আমের শাখা, ফুল দিয়ে সাজাত। সাদা কল্কের জড়ানো বাঁক, ঘটের গায়ে লাল সিঁদুরের প্রলেপ, গাঁদাফুলের উজ্জ্বল হলদে-কমলার মিশেল আর চকচকে কাঁসার ঘটে সদ্য ওঠা সূর্যরশ্মির প্রতিফলন – বছরের নতুন ভোরে অবাক চোখে কখন আমার কিশোরী মনে রঙিন সৃষ্টিশীলতার জন্ম দিয়েছিল তা নিজেও বুঝতে পারিনি।

তবে আজ থেকে দুই যুগ আগের বা ২০২৩-এর বাঙালি হোক, বছরের প্রথম দিনটা তারা রসে-বশে টইটম্বুর থাকতেই পছন্দ করে। দুপুরবেলা বাড়িতে জম্পেশ মধ্যাহ্ন ভোজন – কষা মাংসের ঝোল, পিউলি মাছের চচ্চড়ি, কাঁচা আমের চাটনি আর শেষ পাতে মিষ্টি দই... আঃ, খাওয়াটা একদম জমে যেত!

তারপর ভাতঘুম দিয়ে সন্ধ্যে হলেই বাবা-মা'র হাত ধরে দোকানে দোকানে হালখাতার নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া; দোকানে দেওয়া কোল্ড-ড্রিঙ্কস যারপরনাই গলাধঃকরণে হেউ হেউ ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি আসা। ফিরে এসে গুনতে বসতাম কটা মিষ্টির প্যাকেট হ'ল, আর তাতে টোটাল কতগুলো লাড্ডু, অমৃতি আর ছানাবড়া রয়েছে। কচুরিগুলো অবশ্য ঠান্ডা হয়ে এক্কেবারে শক্ত হয়ে যেত, কিন্তু সিঙ্গারা আর

আলুর তরকারির তখনও জিভে জল আনা স্বাদ। সাথে আসত ঠাকুরের ছবি দেওয়া একপাতার বাংলা ক্যালেন্ডার, যেটা পুরনো হয়ে গেলে পরের বছর আমরা পিছনের সাদা দিকটা একসাথে পিন করে অঙ্কখাতা তৈরী করতাম। তারপর চাঁদের আলোয় বারান্দায় বসে সবাই মিলে আড্ডা আর গলা ছেড়ে গান।

"নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।
উৎসারিত নব জীবননির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃতপুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তিপবনে।"

বাগানের প্রাচীরের গায়ে সন্ধ্যামালতি ফুলের মনকাড়া গন্ধ, ঝাউগাছের মধ্যে জোনাকির ঝিকিমিকি লুকোচুরি, ঝিঁঝির একটানা ডাক, প্রিয় মানুষগুলোর হাসিমাখা মুখের সাহচর্য – সবকিছু মিলিয়েই বৈশাখের প্রথম দিনটা কাটানোর পরিতৃপ্তি যেন ছিল এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস। সেই সন্ধ্যের বয়স বাড়ে না কখনও। আজও নতুন বছরের প্রাক্কালে হাজার কাজের ভিড়ে ঠাসা দিনটায় সেই স্মৃতির সুতো আঁকিবুকি কাটে; ভেসে ওঠে ফেয়ারিটেল সলমা-জরি। জীবন তো বদলাবেই, বদলায় না বৈশাখের সন্ধ্যেয় কৃষ্ণচূড়ার লাল আগুনে রং, বৈশাখী মেলায় রঙিন চুড়ির রিনরিনে সুর – জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় ফি-বছর জেগে ওঠে রূপকথা।

শুভ নববর্ষের অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা সকলকে। একরাশ হাসি ভরে তুলুক নতুন বছরের প্রতিটি দিন।

শিল্পী: অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

সিস্টার নিবেদিতা এবং মাজননী

শান্তনু মিত্র

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অতি নিকট শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাগবাজারের বলরাম বসু। ঠাকুর কলকাতায় এলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলরাম বসুর বাড়িতেই থাকতেন। এই বাড়ির রান্না ছাড়া অন্য কারোর দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করতেন না। এই বাড়িই এখন 'বলরাম মন্দির'।

বলরাম বসুর দুই মেয়ে এক ছেলে। গুগল্ খুললে ছেলে রামকৃষ্ণ বসুর নাম পাওয়া যাবে। মেয়ে ভুবনমোহিনী এবং কৃষ্ণময়ীর উল্লেখ পাওয়া যাবে না।

কোনও একজন শিষ্য ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি যে মাকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পান, তাঁর চেহারা কী রকম?"

ঠাকুর হেসে বলেছিলেন, "বলরামের এই মেয়েটার মতো।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন যে ছোট্ট বালিকাটিকে দেখিয়ে একথা বলেছিলেন, তিনি বলরাম বসুর ছোট মেয়ে, কৃষ্ণময়ী বসু। উনি আমার মায়ের দিদিমা।

কৃষ্ণময়ীর বিবাহ হয় বারুইপুরের জমিদার বিপিন কুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ বহুবার তাঁদের বাড়িতে এসেছেন। সেই ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি এখনও বারুইপুরে আছে।

কৃষ্ণময়ী দশটি কন্যা এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সেই বিশাল জমিদারির একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন ওই একমাত্র ছেলে, অমরেন্দ্র রায়চৌধুরী (আমার মায়ের মামা), কিন্তু তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান; রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন মহারাজ অকুণ্ঠানন্দ নামে। ভাগ্যবলে আমি তাঁকে অনেকদিন ধরেই দেখতে পেয়েছিলাম।

কৃষ্ণময়ীর মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন রত্নমালা, আমার দিদিমা। তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার মায়ের যখন ছয় বছর বয়স তখন তিনি দেহ রাখেন।

মায়ের বাকি নয়জন মাসিদের অনেককেই ছোটবেলায় আমি পেয়েছি। বলরাম বসুর বাড়ি তাঁদের মামার বাড়ি হওয়াতে ছোটবেলা থেকেই এঁরা সবাই সাধুসঙ্গে বড় হয়েছিলেন। অনেক

ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন তাঁরা।

মায়ের বড়মাসি, রাধারাণী বসু; কৃষ্ণময়ীর বড় মেয়ে। তাঁকে আমার মা মাসিরা 'মাজননী' বলে ডাকতেন।

উনি চোখে ভাল দেখতে না পেলেও, বঁটিতে সুন্দর করে আখ কাটতে পারতেন। অসম্ভব স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। অনর্গল কবিতা, মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারতেন।

এই মাজননী খুব ছোটবেলায় সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে ছাত্রী ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে সেইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমরা শুনতাম। একদিন সুযোগমতো মাজননীর মুখের সামনে টেপ রেকর্ডার ধরলাম। তখন ১৯৭৪ সাল।

মাজননী বলছেন, "ছোটবেলা থেকে আমরা মামার বাড়িতে (বলরাম মন্দির) গেরুয়া রং দেখে বড় হয়েছি। এই রং আমার প্রাণের মধ্যে মিশে আছে। কত বড় বড় মানুষরা আসতেন। ঐ বড় হলঘরটা ভরে থাকত। শরৎ মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সদানন্দ – এঁদের কোলেপিঠে মানুষ হয়েছি আমরা। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই আসতেন। আমি তখন অবশ্য খুব ছোট। দূর থেকে দেখেছি। সব কথা মনে নেই; তবে স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিলেত রওনা হচ্ছেন পরিষ্কার মনে আছে। একটা বিশাল গাড়িতে স্বামীজী উঠলেন, সিস্টার নিবেদিতা উঠলেন। আর পরে বই পড়ে জেনেছি স্বামী তুরিয়ানন্দও সে গাড়িতে উঠেছিলেন। এসব কথা তোমরা বইতে পড়বে।

সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে গিয়েই সুর করে বলতে হতো 'সিস্টার নিবেদিতা নম.....ওস্কার', আবার চলে আসার সময়ও একইভাবে বিদায় জানাতে হতো। মনে মনে আজও বলি এভাবে প্রণাম করতে তুমিই শিখিয়েছিলে। আমি যেন চিরকাল এভাবেই সবাইকে প্রণাম করতে পারি।

ভারতবর্ষকে অন্তর থেকে ভালবাসতেন নিবেদিতা। বলতেন, 'তোমরা কখনো নিজেদের ছোট ভাববে না। আমরা সকলেই আর্য সন্তান। হয়তো আমি সাদা, তোমরা অন্ধকার (কালো); কিন্তু আমরা সবাই এক।'

উনি আমাদের ছবি আঁকা শেখাতেন, মালা গাঁথা শেখাতেন।

একদিন বিকেলে আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেড়াতে বেড়াতে আমার বাথরুম যাবার দরকার হয়ে পড়ল। এদিকে ইজেরে গিঁট পড়ে গেছে। সিস্টার নিবেদিতা আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে নিজের দাঁত দিয়ে আমার ইজেরের গিঁট খুলে দিলেন। এতটাই ভালবাসতেন সবাইকে।

বিয়ে ঠিক হবার পর আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ক'দিন পরে কি কাজে স্কুলে গেছি, সিস্টার ক্লাস নিচ্ছিলেন। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম।

কাতরভাবে বললেন, 'তুমি এতদিন কেন আসোনি?'

বললাম, 'আমি যে শ্বশুরবাড়ি যাব।'

ঠিক তেমনিভাবে, যেন শিশুর মতো বললেন, 'আমি তোমার ওপর রাগ করেছি।'

আজ ভাবি কেন সেদিন সবকিছু ছেড়ে তাঁর কাছে চলে গেলাম না! আমার যেন কোনো দিকই ঠিকভাবে হ'ল না।"

আরও অনেক কথা, আবৃত্তি, সেদিন রেকর্ড হয়েছিল। সেই রেকর্ড এখনও আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে যত্ন সহকারে রাখা আছে।

ওঁকে বলতে সাহায্য করছিলেন আমার মা, শৈল মিত্র।

আজ এঁরা কেউ আর নেই। আমার নিজের এখন পঁচাত্তর বছর বয়স। এখন বড় অনুতাপের সঙ্গে ভাবি কেন এঁদের আরো অনেক কথা ধরে রাখার সময় আমার হ'ল না।

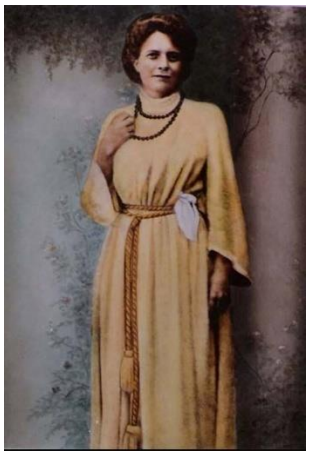

বদলা

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯০৬: দুই ভাই – মুক্তা সিং আর শের সিং:

মাতৃহীন দুই ভাই খেলা করছে রেল লাইনের ধারে। তাদের বাবা, সর্দার তেহল সিং পাঞ্জাবের একটা ছোট্ট গ্রাম, সুনাম-এ রেলওয়ে ক্রসিংয়ের গুমটিদার। গরিব বাপ কালীপুজোর দিনে ছেলেদের কয়েকটা ধানিপটকা কিনে দিয়েছে। বিকেলের মেলট্রেন আসবে – দুটো পটকা রেললাইনে রেখে দুই ভাই কান পেতে আছে পটকা ফাটার শব্দ শুনবে বলে। অনির্দিষ্টভাবে ট্রেনের সামনে আজ পুলিশভরা ট্রলি কার। ট্রেনে নিশ্চয়ই কোনো বড় ইংরেজ অফিসার ট্র্যাভল করছে। পটকা ফাটার দুম দুম শব্দ শুনে ট্রলি থেমেছে। বেয়োনেট লাগানো রাইফেল হাতে চারজন পুলিশ আর একজন লালমুখো অফিসার তাড়া করেছে দুটি বালককে। অফিসার তাদের হাত পেছনে বেঁধে নুড়ির ওপর উপুড় করে রেখেছে পায়ের বুটের চাপে। করুণ কান্নার আওয়াজ পেয়ে তাদের বাবা, তেহল সিং ছুটে এসেছে ক্ষমা চাইতে। হাঁটুগেড়ে বসে সাহেবের পাদুটো জড়িয়ে ক্ষমা চাইছে। রাগে আত্মহারা সাহেব বুটের লাথি মেরে চলেছে তেহল সিংয়ের বুকে। তেহল সিং ছিটকে পড়েছে রেল লাইনের ওপর। মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে। সাহেবের আদেশে তেহল সিংকে জেলে এনে এক অন্ধকূপ ঘরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। জেলার সাহেব ফার্স্ট-এড দেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। প্রচুর রক্তক্ষরণে তেহল সিং খুবই দুর্বল; এমনকি হাঁটার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। পেনাল কোর্টে তেহল সিংয়ের অবর্তমানেই জজসাহেব এক নিরপরাধীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন এবং নিরাপত্তা ভাঙার জন্য সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন।

জজসাহেবকে ফাঁকি দিয়ে তিনদিনের মাথায় তেহল সিং মারা যায়। সাহেব অফিসারের কোনও শাস্তি তো হয়নি, বরং পদোন্নতি হয়েছে। তখনকার দিনে তথাকথিত সভ্য ব্রিটিশ শাসনের মাপকাঠি এই রকমই ছিল।

বাপ-মাহীন দুই ভাইকে সুনাম গ্রামের কালেক্টর সাহেব ভয়াবহ এক অনাথ আশ্রমে চালান করে দেয়। এই আশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য কেমন করে শিশুদের নৈতিক শক্তিকে দমন করে পরাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়। এমনকি নব ভাবধারা ধারণের হেতু তাদের নতুন নামকরণও হয়। মুক্তা সিং এখন সাধু সিং, আর শের সিং হয়ে যায় উধম সিং। বলা বাহুল্য যে সেদিন এই অধিকতর নিরাপত্তার কারণ হ'ল একজন স্বনামধন্য ট্রেনযাত্রী – স্যার মাইকেল ও'ডায়ার। তাঁর সাথে আমাদের আবার দেখা হবে।

১৯ বছরের ছেলে উধম সিং, পানিপাঁড়ে:

ব্রিটিশ অনাথ আশ্রমের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বড় ভাই সাধু সিং কৈশোরের প্রারম্ভেই মারা যায়। সঙ্গীবিহীন পরাধীনতার একাকী জীবন শুরু করে উধম সিং। শত চেষ্টা করেও অনাথ আশ্রমের ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতি উধম সিংয়ের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সে ভোলেনি তার বাপের রক্তাক্ত মুখচ্ছবি, বিনা চিকিৎসায় কারাগারের অন্ধকূপে তার বাবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ, অনাথ আশ্রমের কঠোর শাসনে তার দাদার করুণ মৃত্যু। তবুও সব পুঞ্জীভূত দুঃখকে চেপে রেখে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে জনসাধারণের নিত্য-কল্যাণ কাজে।

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ সাল – আজ শিখ সম্প্রদায়ের মহোৎসব, বৈশাখী পার্বণ। কাতারে কাতারে লোকজন এসেছে হরমন্দির সাহেব গুরুদ্বারাতে পুজো দিতে। জালিয়ানওয়ালা বাগের ময়দানে হিন্দু, শিখ, মুসলমান মিলে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের সমাবেশ। বৈশাখ মাসের কাঠফাটা গরম, সকলেই তৃষ্ণার্ত। আজ উধম সিং পানিপাঁড়ে কুয়ো থেকে কলসী কলসী জল তুলে বিতরণ করছে তৃষ্ণার্ত জনসাধারণকে। আনন্দে, উল্লাসে আবালবৃদ্ধবণিতা আপ্লুত। কোথাও গুরুগ্রন্থসাহেব পাঠ হচ্ছে, কোথাও হনুমান চালিসা, কোথাও নামাজ পথ, কোথাও ভাংড়া নৃত্য। বড় একটা দল গান্ধীজীর অহিংসাবাদের ভাষণ শুনছে। আর ফুলের মতো ছোট্ট ছেলেমেয়েরা মাঠে ছুটোছুটি করে খেলছে।

হঠাৎ মিলিটারি ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড় শব্দ। তার সাথে মিলিটারি বুটের কুচকাওয়াজ। মিলন উৎসব ভেঙে গিয়ে সারা মাঠে এক থমথমে ভাব। প্রায় একশ'জন গুর্খা সৈন্য বেয়োনেটপরা রাইফেল তাগ করে তৈরী। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের অপার্থিব হুঙ্কার – "ফায়ার"। ধর্মভীরু নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর এ কী পাশবিক অত্যাচার! মরা মায়ের বুকের ওপর পড়ে

শিশুর কান্না, বুলেটে আহত বৃদ্ধের জল জল করে করুণ আর্তনাদ, গুলি এড়াবার জন্য কাতারে কাতারে জনসাধারণের কুয়োতে ঝাঁপ। সব গেটে তালাচাবি, পালাবার গলি আটকে রেখেছে আর্মার্ড কার। ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চলেছে ১৩০২ জন মারা গেছে। উধম সিংও আহত, কিন্তু বেঁচে আছে।

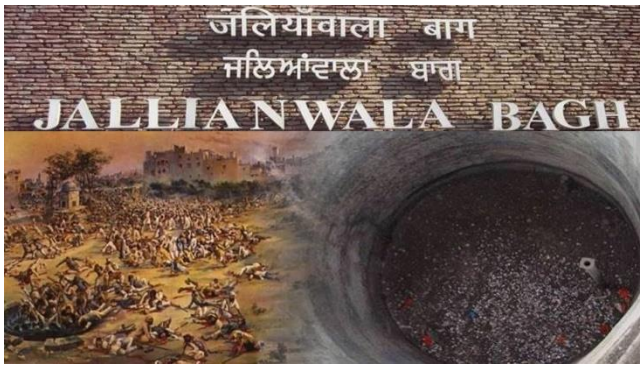

সভ্যতার মুখোশপরা ব্রিটিশদের আরো কিছু সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করি। পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও'ডায়ার, যার সঙ্গে আমাদের স্বল্প পরিচয় হয়েছিল প্রথম অধ্যায়ে – তাঁরই সম্পূর্ণ সমর্থনে সেদিন জালিয়ানওয়ালা বাগের নরহত্যা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর উক্তি – "নেটিভদের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।" আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের দম্ভোক্তি – "দুর্ভাগ্য যে রাস্তাটা সরু, তাই মেশিনগান দুটো ভেতরে নিয়ে যেতে পারিনি। পারলে আমার চাইতে বেশি খুশি বোধকরি আর কেউ হতো না।"

বিলেতে হাউস অফ লর্ডস অভিনন্দন জানাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে। বহু ব্রিটিশ জনসাধারণ ডায়ারের নরহত্যাকে সমর্থন করেছে। এমনকি Rudyard Kipling, যিনি ভারতবর্ষের জীবনধারার বিদ্রূপাত্মক লেখক, উঁচু গলায় বলেছেন – "ডায়ার ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছে।" 'ডায়ার ফান্ড' খুলে কিপলিং ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড ডায়ারকে উপহার দিয়েছেন।

সবার আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের 'নাইট'

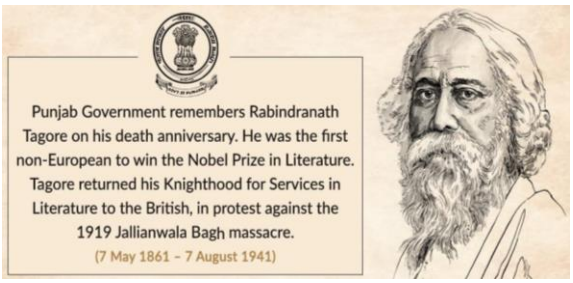

উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট লর্ড জেমসফোর্ডকে লিখলেন, "বিচারের নামে যারা আমাদের দেশের অসহায় নরনারীকে এমনভাবে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের দেওয়া এই সম্মানের গুরুভার বইতে আমি অক্ষম।"

অসহায় নরনারীদের নির্বিচার হত্যা দেখে উধম সিংয়ের মনে এল এক অমোঘ জাগরণ। স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র পুষ্করিণীতে আকণ্ঠ ডুবে এই চরম অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার শপথ নিল উধম সিং। নিরপরাধ, অসহায় ভারতবাসীদের নির্মম হত্যার মাশুল হিসাবে গভর্ণর ও'ডায়ার আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে প্রাণ বলিদান দিতে হবে।

১৩ই মার্চ, ১৯৪০: ঠিক একুশ বছর পর:

'গরধার-এ-গঞ্জ' পার্টির স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে উধম সিংয়ের পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল। ২৩শে আগস্ট ১৯৩১ সালে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জানল যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার বহু বছর পঙ্গু অবস্থায় থেকে সেরিব্রাল হেমারেজে মারা গেছেন। মারা যাবার আগে ডায়ার বলেছেন – "জানি না আমি জীবনে কী খারাপ বা ভাল কাজ করেছি; ভগবানের দরবারে আমার চরম বিচার হবে।"

উধম সিং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের থেকে গভর্ণর ও'ডায়ারকেই বেশি দোষী সাব্যস্ত করেছিল। কারণ জেনারেল ডায়ার গভর্ণরের আদেশেই এই কসাইয়ের কাজ করেছেন; এবং 'জালিয়ানওয়ালা বাগের কসাই' (Butcher অফ Jalianwala Bagh) নামে কুখ্যাত হয়েছিলেন।

গভর্ণর ও'ডায়ার চাকুরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে বহাল তবিয়তে ইংল্যান্ডে আছেন। তবে তাঁর প্রেতাত্মা, ওরফে উধম সিং তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্রিটিশ রাজত্বের রাজদ্রোহীদের ইংল্যান্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ। উধম সিং পরিচয় বদলে নিজের নামকরণ করেছে রাম মহম্মদ সিং আজাদ। এই নামের মধ্যে সে সর্বভারতীয় সমন্বয় খুঁজে পায়। বেশভূষায় এখন সে পাগড়ির বদলে ফয়েজী টুপি পরে। বহু দেশ দেশান্তর ঘুরে সব শেষে ১৯৩৪ সালে সে লন্ডনে পৌঁছায়। ছোট এক এঞ্জিনিয়ারিং কম্পানিতে কাজ করে। মেধাবী আর হাতের কাজ ভাল বলে উধম সিংয়ের খুব সুখ্যাতি। তবে উধম সিংয়ের লক্ষ্য গভর্ণর ও'ডায়ার। নিজের যথাসর্বস্ব পুঁজি খরচ করে অনেক চেষ্টায় সে কালাবাজার থেকে ছয় খোপের একটা রিভলভার ও কিছু গুলি

কিনেছে। ছ'বছর ধরে চেষ্টা করছে গভর্ণর ও'ডায়ারকে বাগে পেতে। ১৩ই মার্চ ১৯৪০ সাল – লন্ডনের 'ক্যাক্সটন হলে'-এ সেই সুযোগ এল। লর্ড জেটল্যান্ডের সভাপতিত্বে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে ভাষণ দেবেন বিশ্রামপ্রাপ্ত পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও'ডায়ার। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উধম সিং। হাতে একটা মোটা বাইবেল। বাইবেলের পাতা কেটে খোপের ভেতরে লুকানো উধম সিংয়ের রিভলভার। সভা শেষ। বিদায়ের পালা। মাইকেল ও'ডায়ার ঝুঁকে লর্ড জেটল্যান্ডের সঙ্গে কথোপকথনে মশগুল। উধম সিংয়ের রিভলভার সক্রিয় – দ্রাম! দ্রাম!... ছ'বার গুলির শব্দ।

Udham Singh (second from left) being taken from Caxton Hall after the assassination of Michael O'Dwyer2

ও'ডায়ারের বুকে ও পেটে দুটো অব্যর্থ গুলি লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু। সকলে পালাচ্ছে; কিন্তু উধম সিং নিশ্চল। 'বদলা'র স্বর্গীয় শান্তিতে আজ তার মানসিক সমাধি।

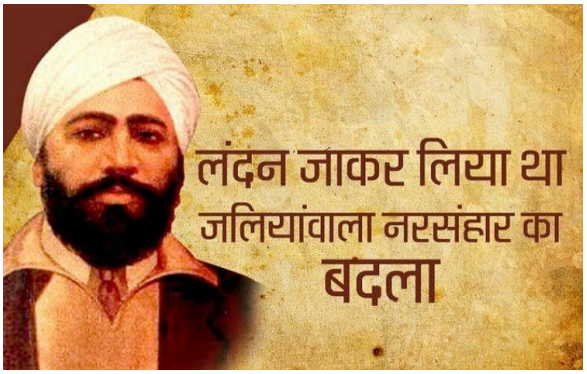

১লা জুন ১৯৪০ সালে উধম সিং কুখ্যাত 'পেন্টনভ্যালি জেল' প্রাঙ্গণে বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর শেষ কথা, "কর্তব্য শেষ করে বিদায় নিলাম।" শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালো সারা ভারতের জনসাধারণ।

দেশের নেতাদের কয়েকটি মতামত তুলে ধরি এখানে –

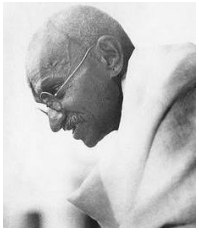

গান্ধীজী বললেন – "সাহসিকতার পরিদর্শনে অপরিমিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উধম সিং এই হিংস্র কাজ করেছে, এতে আমার সমর্থন নেই।"

নেহেরু বললেন – "এই হত্যাকাণ্ডে আমি বিশেষ দুঃখিত। আশাকরি ভারতের স্বাধীনতার পথে এই হত্যাকাণ্ড বাধার সৃষ্টি হবে না।"

শুধু নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। বললেন – "স্বাধীনতার পবিত্র বেদীতে প্রাণ বলিদান দিয়ে উধম সিং সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু আগেই বিপ্লবী সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মান দিয়ে গেছেন –

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথের গান ও গানের অন্তরালে

সুমিতা বসু

রবি ঠাকুরের প্রিয় ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, "তোমরা সব রবিকা'র জীবনী খুঁজছ, রবিকা'র গানই তো তাঁর জীবনী। গানের মধ্যে রবিকা'র সারা জীবন ধরা আছে। সুর ও কথার অন্তরে তাঁর জীবন্ত ছবি ওখানেই পাবে।" 'দামিনীর গান' বইটিতে শ্রী শঙ্খ ঘোষ এই তথ্যটি জানিয়েছেন এবং সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন শ্রীমতী রাণী চন্দের 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' বইটির কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা জীবন'ভর গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, ও গেয়েছেন – সংখ্যায় যা দু'হাজারেরও বেশি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত নামে অত্যন্ত সমাদৃত। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ১৯২৩ সালে আমেদাবাদে বসে লিখেছিলেন,

"তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া"...

গান তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন দু'হাত ভরে। সেই গান মূল ভাষায় পড়তে পারি, শুনতে পারি, গাইতে পারি; সত্যিই আমরা তাঁর অরূপরতনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু যোগ্য কি? সেটাই প্রশ্ন। পেরেছি কি তাঁকে দিতে যথার্থ সেই মান?

"শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে, পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।"

গান তো শুধু গান নয়, আসলে কবির মনের আকাশে তাঁর ভাবনা, তাল ও সুরের যে প্রকাশ ও বিকাশ, তার অনুরণন এই সুদীর্ঘ দেড়'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে বহমান। সেই অনুরণন কি আজও একইভাবে আমাদের মনে বাজে? কবি যে অবস্থায় ও সামাজিক পরিবেশে বিশেষ কোনো গান লিখেছিলেন, আমরা কি সেইসব গান পড়ে, শুনে বা ভেবে সেই সময়ের অথবা কবির সেই মানসিক অবস্থার স্পর্শ পাই? রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের একটি গানে বলছেন, "এই কথাটি মনে রেখো / আমি যে গান গেয়েছিলেম"... কোন কথাটি মনে রাখার কথা বলছেন?

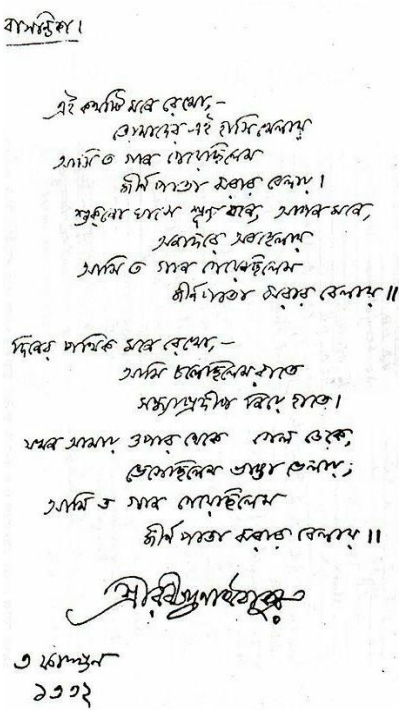

বললেন, তোমাদের এই হাসিখেলায় / অনাদরে অবহেলায় / আপন-মনে / জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেম | রাগ খাম্বাজ ভিত্তিক, দাদরা তালের ওপর ভিত্তি করে উপরোক্ত গানটি লেখা শান্তিনিকেতনে – সাল ১৯২১, অর্থাৎ কবি তখন ষাটের কোঠায় পা দিয়েছেন | এই রকম মনে রাখার কথা আরো অনেক কবিতা ও গানেই আছে; যেমন – "তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে"... প্রসঙ্গত পাঠককে মনে করিয়ে দিই, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলিই আগে কবিতা হিসেবে লেখা হলেও, পরে সুরারোপিত হয়ে সেগুলি গানের জগতেও জায়গা করে নিয়েছে স্বগরিমায়। যেমন ১৮৮৭-তে লেখা মানসীর "তবু" কবিতাটি চোদ্দো মাত্রার (৮+৬) সনেটধর্মী।

"তবু মনে রেখো যদি / দূরে যাই চলে
সেই পুরাতন প্রেম / যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত / কাহিনী কেবল
ঢাকা পড়ে নব নব / জীবনের জালে।"

কথার ও ছন্দের সামান্য পরিবর্তনে এই গানটিই কিছুদিন পরে কীর্তনের সুরে ও দাদরা তালে হয়ে উঠল চিরকালীন এক প্রেমের গান –

"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি –
তবু মনে রেখো।"

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার গান আমার আপন মনের গান... বাল্যকালে ঘরে ওস্তাদ আসত | কিন্তু আমার একটা গুণ আছে... মাস্টারির ভঙ্গী দেখলেই দৌড় দিয়েছি | যদুভট্ট আমাদের গানের মাস্টারমশাই, আমায় ধরার চেষ্টা করতেন... আমি অত্যন্ত পলাতক ছিলাম বলেই কিছু শিখিনি | তাই আমি একটা কৌশল করেছি, কবিতার কাছ ঘেঁষে সুর লাগিয়ে দিয়েছি, লোকের মনে ধাঁধা লাগে, কেউ বলে সুর ভাল, কেউ বলে কথা... আমি আমার কথাগুলিকে সুরের ওপরে দাঁড় করাইতে চাই, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করার জন্য |"

সুরের আড়ালে কথাকে জানা ও বোঝার জন্য গায়ক ও শ্রোতার পিছনে এসে দাঁড়াল পাঠক – রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁর কাছে মনে ও মননে অনুভব এবং অনুপ্রেরণার উৎস | এখানেই পাঠক ও লেখকের এক নিভৃত বন্ধন তৈরী হয়ে গেল, যা একান্তই ব্যক্তিগত | গীতবিতান খুলে গান শুধু পাঠ করলেই চোখের সামনে নানান চিত্রকল্প ও রূপকল্প মুহূর্তে ভেসে আসে, যেমন –

"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে |
সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো
আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে..."

কিংবা,

"ধরায় তখন তিমিরগহন রাতি
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে,
'আঁধারে পথ চিনবে কেমন করে?'
আমি কইনু, 'চলব আমি নিজের আলো ধরে,
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি।"

গানটির শুরু, "অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক..."

রবীন্দ্রসঙ্গীত একান্তই উপলব্ধির, বোধের, অনুভবের | সুর ও কথার যুগ্ম স্রোতে অনুরাগী পাঠক, শ্রোতা ও গায়কের মনে আনে সেই অনুভূতির ব্যঞ্জনাময় 'ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে'র দ্যোতনা | রবীন্দ্রঙ্গীত পাঠ নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ্যসূচি নির্মাণের কথা বারবার করে শ্রী সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন | এর প্রয়োজনীয়তা যে সত্যিই আবশ্যিক, তা বলাই বাহুল্য |

ফিরে আসি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টিতে – তাঁর গান পড়তে, গাইতে বা শুনতে শুনতে সেই গানের মধ্যে দিয়ে কবির মানসিক বা তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, কিংবা কবির উপস্থিত ঘটনার অবস্থাকে কি বোঝা যায়?

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে কথা ও সুরের ব্যাপারে আরো একটি কথা – পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথের পশ্চিমী চালবোল ও ভাবনা এবং পাশাপাশি পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সনাতন উপনিষদীয় দর্শন ও ব্রাহ্ম ধর্মে অনন্ত আস্থা ছোট্ট রবির বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে ওঠার নেপথ্যে এক সুস্পষ্ট দাগ রেখে গেছে | এর পাশাপাশি ১৮৮০ দশকের শেষদিক থেকে জমিদারি প্রদর্শনের কারণে পদ্মাবক্ষের দিনগুলিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাংলার লোকজ কীর্তনিয়া, রামপ্রসাদী, বাউল সুরও কবিমনে অনায়াসে মিলে গেল ওই পশ্চিমী ও ধ্রুপদী প্রাচ্য সুরের মধ্যে | তৈরী হ'ল অনেকান্ত রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে বাঙালির নিজস্ব রবীন্দ্রসঙ্গীত | আসলে বেদজ্ঞ ঋষিতুল্য অথচ আধুনিক এক যুগপুরুষের লেখনী থেকে এই সঙ্গীতের জন্ম, ভারতীয় সনাতন পটভূমিকার মতো, শতাধিক শাখা-প্রশাখা মিশে গিয়ে বহমান গঙ্গার মতো তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত কালোত্তীর্ণতার স্বাক্ষরবাহী | ধরা যাক এই গানটি – "হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই", বাংলার নিজস্ব কীর্তনাঙ্গের এই গান গাইতে গাইতে এক নিঃশ্বাসে কেউ যদি গায় – "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে |" কোথাও কি কোনো ছন্দপতন আছে এখানে? গান্ধীজী ও আরো অনেকের অত্যন্ত প্রিয় এই গান নিজের জোরেই কালোত্তীর্ণ একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত |

আরেকটি গানের কথা ধরা যাক | যদি সকলে বসে একসঙ্গে তালি দিয়ে গায়, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল" আবার একইভাবে গায়, "জয় হে, জয় হে, জয় হে" তাহলে সুরের মূলসূত্রটা কোথা থেকে এল বোঝা মোটেই কঠিন নয় | কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে ওই মূল সুরটি কোথাও কি বাধা দেয়? তাতে কী বা যায় আসে, স্বগরিমায় রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলিই চিরন্তন | তাঁর বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় বহু গানই বাংলার একান্ত নিজস্ব বাউল সুরে গাঁথা, যেমন –: "গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ / আমার মন ভুলায় রে", "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা" কিংবা অমর স্বাক্ষরবাহী "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" ইত্যাদি। শ্রদ্ধেয় সঞ্জিতা খাতুন তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ' বইটিতে যথাযথই লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যে একটি

বাউলভাব আছে। বাউলসুর, বাউলভাব তাঁর আপন অনুভূতিতে জারিত হয়ে রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। সেখানে বাউলের ঔদাস্য কবির জীবনতৃষ্ণার কাছে হার মেনেছে।"

রবীন্দ্রনাথের লেখায়, বিশেষত গানে ক্ষণকালের আভাসের মাঝে চিরকালের কথা অনেক সময়ই পাই। কখনো তদানীন্তন ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনও দেখি, আবার কখনো এই রবির লেখনীর মাঝেই ওস্তাদজীর ভুবনজোড়া আসনখানিও প্রতিভাত হয় মুহূর্তের অভিঘাতের ওপরে। এমনই গানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানা-চেনার জন্য আমি তিনটি গান নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম গানটি –

"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল" –

শান্তিনিকেতনের রুক্ষ বালি জমিতে জলের কষ্ট বরাবর। ১৯১৩ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণের সময় কবি এই কূপ খনন পদ্ধতিটি শিখে আসেন। গরমের দাবদাহে ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে নলকূপ খননের কাজকে উদ্দীপিত করার জন্য কবি লিখে ফেললেন,

"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্
ভেদ কর কঠিনের ক্রূর বক্ষতল"

তারপর আর কী! কাহারবা তালে, মিশ্র ইমন রাগে সুর বসিয়ে শান্তিনিকেতনের দুর্দান্ত গরমে অতি কঠিন ও শ্রমসাধ্য কূপ খননও বেশ সহজ হয়ে গেল গানের তালে তালে কলকল্ ছলছল্ তাল মিলিয়ে।

দেশাত্মবোধক পর্যায় থেকে একটি গানের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে কবির লেখনী থেকে অনেক গানই বেরিয়েছে এবং সমসাময়িক ঘটনাগুলির প্রতিফলন গানগুলিতে থাকলেও প্রায় ১২০ বছর পরে আজও আমরা এর রসাস্বাদন করি গানের একান্ত উৎকর্ষেই। যেমন, "বাংলার মাটি বাংলার জল", "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" কিংবা "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"। "সার্থক জনম আমার" গানটি নিয়ে দু'একটি কথা বলব। সূত্র: সমীর সেনগুপ্তর 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ'; পৃষ্ঠা ৯৯ এবং প্রশান্ত পালের 'রবিজীবনী'। মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে বোমা কারখানা আবিষ্কার ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে আলিপুর কোর্টে দীর্ঘ মামলা চলেছিল ১৯০৮-০৯ জুড়ে। মামলার ১১৩-তম দিনে আদালতে এক অভূতপূর্ণ ঘটনা ঘটল – পরদিন তার বিবরণ বেরিয়েছিল, 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকায় যার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় –

"...ধর্মাবতারের কার্য তখন আরম্ভ হয় নাই; আসামীদিগের হাতকড়ি খোলা হয় নাই; প্রহরীদিগের বুটের শব্দ থামে নাই – এমন সময় কয়েদীদের খাঁচা হইতে একটি উচ্চ কিন্তু মধুর কণ্ঠস্বর নির্গত হইল। বিচারকক্ষের সমস্ত গোলমাল এক লহমায় স্তব্ধ হইল। ...সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।"

কিছু বিতর্কিত হলেও জানা যায়, দেশাত্মবোধক এই গানটি উল্লাসকর দত্তের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল – যে গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রক্তাক্ত মুহূর্তে কবির লেখা।

পূর্বোক্ত দুটি গানের নেপথ্যের ঘটনা ও অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর সব গানেই কি বোঝা যায়? রবীন্দ্রনাথের গান লেখার পিছনে অনেক কাহিনী। ওই যে শুরুতে বলেছিলাম, এর পিছনে যেন হাজার হাজার বছরের ঋষিতুল্য এক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব আছে; প্রমাণ এই গল্পটি।

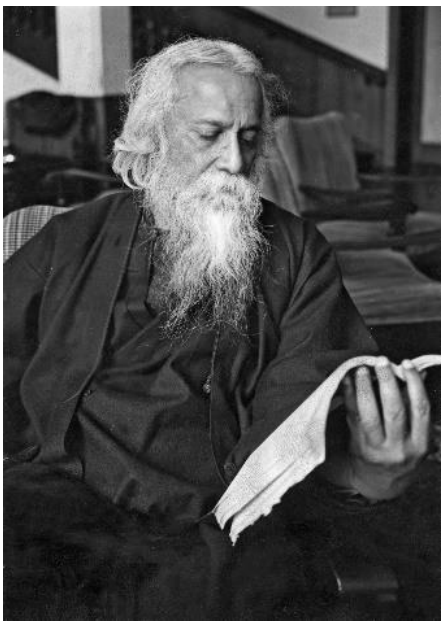

২১ মে, ১৯১৬। কোসামারু জাহাজে চীন সাগর বক্ষে যাত্রাপথে হংকং ও সিঙ্গাপুরের মাঝখানে কোথাও মধ্যরাত্রে উঠল প্রচন্ড টাইফুন। জাহাজ টলোমলো, যাত্রীরা এমনকি ক্যাপ্টেনও আতংকিত, ভীত, সন্ত্রস্ত। প্রাকৃতিক এই দুর্দান্ত ও ভয়ানক দুর্যোগে সৃষ্টিকর্তার করুণ, উদার, মঙ্গল – কোনো স্পর্শ কি ছিল, যখন সেই মুহূর্তে সকল যাত্রী একেবারে প্রাণসংশয়ের

মুখোমুখি? সেই সময় ছাপান্ন বছরের কবি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে কথা ও সুর একসঙ্গে রচনা করে আপনমনে গাইছেন,

"ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি..."

এবং শেষ দুটি লাইন...

"তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
আমার হৃদয়-মাঝে দিক্-না আনি..."

এখানে আমরা যুগ যুগান্তরের এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে দেখি, যিনি অপৌরুষীয় বেদের ঋষির মতোই অসীম আত্মার চিরকালের পূজারী। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রাত্রে ট্রেনে আসতে আসতে পিতা রবীন্দ্রনাথ ধু ধু প্রান্তরে দুকূলভাঙ্গা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পূর্ণতাই দেখেছিলেন। এমনকি জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার দারুণ অসুস্থতার পর তার মৃত্যুর ছায়াঘন সেই দিনগুলিতে লিখেছিলেন,

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?
জয় অজানার জয়।
এই দিকে তোর ভরসা যত, ওই দিকে তোর ভয়!
জয় অজানার জয়।"

সন্তানের মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও তিনি দেখতে পান সেই 'ন হন্যতে' আত্মাকে, যা 'হন্যমানে শরীরে' বিনষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ আজীবন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, "ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।" সনাতন উপনিষদের বাণী, "খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" (কর্ম / শান্তিনিকেতন)

শ্রী সমীর সেনগুপ্ত তাঁর 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে লিখেছেন, "এই মানুষটির উত্তরাধিকারের একটি অর্বুদতম ভগ্নাংশও বাঙালি হিসেবে আমার ভিতরে বাহিত হয়ে এসেছে বলে, আমাকে নতুন করে ভাবতে হয়, আমি কি এই উত্তরাধিকারের যোগ্য? প্রশ্নটা তো আমাদের সকলেরই। আমরা তাঁর ধ্যানের ধনখানির উত্তরাধিকারী, কিন্তু সত্যিই কি দিতে পেরেছি সেই যথাযোগ্য মান?"

নিজের মৃত্যুর কিছু আগে শুনতে চেয়েছিলেন নিজেরই একটি গান, "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা / বিপদে আমি না যেন করি ভয়...", বলেছিলেন, এগুলি মুখস্থ করে রাখতে। সত্যি, এগুলি শুধু তো গান নয়, এগুলি যেন মন্ত্রস্বরূপ। যতই তিনি বলুন, "কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে / আজি হতে শতবর্ষ পরে" (১৪০০ সাল কবিতা / চিত্রা), আমরা নিশ্চিত জানি যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, বাঙালি সগর্বে বাংলায় পড়তে, লিখতে, ও ভাবতে থাকবে, আমরা নিশ্চিতভাবে ততদিন পারব তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে যথাযোগ্য সম্মানটুকু দিতে।

প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম যে কবিতাটি দিয়ে, ফিরে আসি আবার সেখানেই, "যে তাহারে দিতে পারে মান..."
শেষে কবির আশীর্বাদ ও নিবেদন আমরা যেন করজোড়ে সশ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে পারি –

"তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি।"

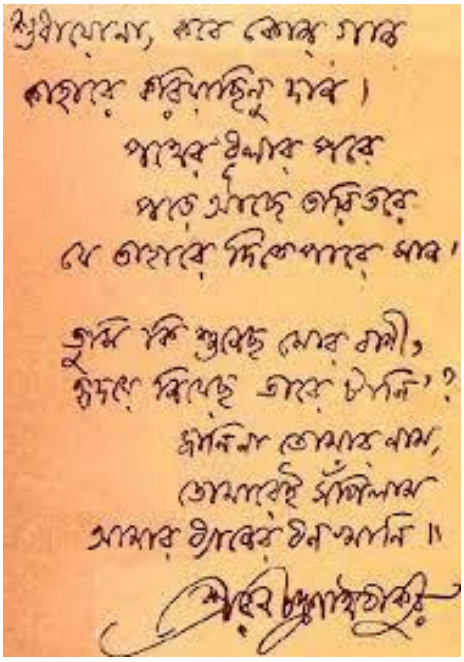

বাঙালি সমাজের দুঃখজনক কর্মকাণ্ড

ভজেন্দ্র বর্মন

বাঙালি সমাজের ভাষা এক হলেও এটি বহুমুখী। প্রধানতঃ ধর্ম, জাত, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষার মান, জন্মস্থান, কাজকর্মের স্তরভেদে আমরা একজন অন্যজনকে তুলনা করি। কে কতটুকু সম্মান পাওয়ার যোগ্য বা অযোগ্য অথবা কে কতটা উঁচু বা নীচু তা নির্ধারণ করি। সময় বিশেষে বা সুবিধামত কে কার মিত্র কিংবা শত্রু তা বেছে নিতে চাই। এইসব কারণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা প্রায়শই সম্ভবপর হয় না। খন্ড খন্ড চিন্তা করা, খন্ড খন্ডভাবে থাকা যেন আমাদের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলো অন্য সমাজেও কম বেশি আছে, তবু মনে হয় আমাদের মাঝে এদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

বাঙালিদের অনেক কর্মকান্ড ও আচরণ খুবই দুঃখজনক, কিছু আচরণ নিন্দনীয়ও বটে। আচরণসহ কিছু বিষয় নীচে বর্ণনা করা হ'ল। কেন তাঁরা এসব করেছেন বা করেন তার সুস্পষ্ট কারণ ও যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। মনে হয়, এসব বহুদিন ধরে চলে আসছে বলে অনেকে এগুলো সুবিধাজনক কিংবা লাভজনক বলে মনে করেন এবং প্রশ্রয় দিতে চান।

ধনীর চোখে গরীব বাঙালি

সমাজে গরীব ঘরে জন্মগ্রহণ করা যেন শত অভিশাপ সাথে নিয়ে এ পৃথিবীতে আসা। অতীতে এটা যে কতটা তীব্র ছিল, তা আমরা বুঝতে পারি ৫০ বছর আগের চলচ্চিত্রগুলো দেখে। ঝি ও চাকর, যাঁরা প্রধানত গ্রামাঞ্চলের মানুষ, তাঁদের অবস্থা থেকে আন্দাজ করা যায় শহরের মানুষ কীভাবে তাঁদের ব্যবহার করতেন এবং কী চোখে দেখতেন। ধনী মালিকরা খুব একটা টাকাকড়ি না দিয়ে তাদের জীবনভর খাটাতেন। এখনও এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে এখন মালিকরা একটু নমনীয়; কারণ, তা না হলে তাঁদের কাছে কাজের লোক রাখা কঠিন। বাঙালি সমাজের চাকর বা ঝিরা কাজকর্মের জন্য ন্যায্য বেতন পেলে তাঁদের পরিবারের কত না উপকার হতো!

গরীব মানুষদের দেখলেই চেনা যায়। তাঁরা নোংরা এবং জীর্ণ কাপড় পরেন। হাড্ডিসার দেহ নিয়ে কষ্ট হলেও তাঁরা ভারী বোঝা বহন করেন বা ঠেলে নিয়ে যান। আরো দেখি, যাঁরা গরীবদের দ্বারা এসব করান, তাঁরা অনবরত গালিগালাজ করে থাকেন। একটু উনিশ-বিশ হলে ধমক দেন এবং চড় থাপ্পড়ও মারেন।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সম্পর্ক

১৯৫১ সনের জরীপে ভারতে শিক্ষিত মানুষের হার ছিল ১৮ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ১৯ শতাংশ। শিক্ষিতের হার নির্ণয় করতে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা তার উর্ধ্বে যাঁরা পড়েছেন তাঁদের গণ্য করা হয়। ভারতে এখন তা বেড়ে ৭৫ শতাংশ হয়েছে। ভারতীয় উপ-মহাদেশের শিক্ষিতের হার বর্তমানে ৫৫ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে। এতে বোঝা যায় যে বর্তমানে যাঁরা শিক্ষিত বলে গণ্য হন তাঁদের অধিকাংশ পরিবার খুব বেশী হলে তিন থেকে চার প্রজনন ধরে শিক্ষিত।

অতীতে শহরে যতটা শিক্ষালাভ করার সুবিধা ছিল, গ্রামাঞ্চলে তা ছিল না। স্কুল না থাকায় গ্রামের মানুষ যুগের পর যুগ শিক্ষার আলো দেখেননি। তাই অশিক্ষিত (বা গণ্ডমূর্খ) এবং অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ গ্রামাঞ্চলে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগই দরিদ্র ছিলেন। সামন্ত-তান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় তাঁরা অত্যাচার, অবিচার, অনাচারের শিকার হতেন। সমাজে তাঁদের নীচু বলে মনে করা হতো। তাঁদের প্রতিবাদ করার বা কথা বলার সাহস থাকত না। এখন গ্রামে অশিক্ষিত মানুষের হারই বেশী। এখনও এসব আচরণ সেখানে অব্যাহত। কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় নেতার সালিশীর অন্যায় রায় তাঁরা নিঃশব্দে মেনে নেন। তাঁরা অহরহ জোর-জবরদস্তির শিকার হন। চাইলেও তাঁরা প্রশাসনের সাহায্য পান না।

ধর্মে-ধর্মে বিভেদ

প্রধানত চারটি ধর্মের মানুষ নিয়ে বাঙালি সমাজ। এগুলো হ'ল হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান। এ ছাড়া অল্প সংখ্যক বিভিন্ন উপজাতিরা নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে বাঙালিদের মাঝে বাস করেন। বাঙালি সমাজে বাংলাদেশে ইসলাম এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর নির্ভর করে সংখ্যালঘুদের উপর কীরকম হয়রানি, অত্যাচার এবং জবরদস্তি হওয়া সম্ভব। কখনও মনে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা সততা, নিয়ম-নীতি বা আইনের তোয়াক্কা করেন না। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন অনেক সময় মিথ্যা সাজানো ঘটনা বা সামান্য ব্যাপার নিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করেন, লুটপাট করেন এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে

তাঁদের নিজ-অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেন। পরে দেখা যায় তাঁরা দখলকৃত জমিজমা, দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের সাহায্যে নিজেদের দখলে নেন।

পিতামাতার প্রতি বর্তমান প্রজন্মের সহনশীলতা

পিতামাতার প্রতি বর্তমান প্রজন্মের সম্পর্ক নতুন রূপ নিয়েছে। তাঁদের কেহ কেহ পিতামাতাকে সমস্যা বা বোঝা মনে করেন। এক প্রজন্ম (আনুমানিক ২৫ বৎসর) আগেও এ প্রবণতা ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। তখন বৃদ্ধ পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানরা নিতেন। এখন এটা বদলে যাচ্ছে। কেন এটা হচ্ছে? যে সমাজে কোন বৃদ্ধভাতা নেই, যেখানে সরকার বা দাতা-সংস্থার মাধ্যমে কোনরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা নেই, যাতে তাঁরা আশ্রয় অথবা খাদ্য পেতে পারেন – সেখানে কী করে বৃদ্ধ পিতামাতার শেষের দিনগুলো কাটবে? এর পিছনে পুত্র বা কন্যার দ্রুত আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন এবং ধনী হওয়া যতটা দায়ী, ততটাই হয়তো ইচ্ছাপূর্বক বৃদ্ধ পিতামাতার দায় এড়ানোর প্রবণতা কাজ করে। গ্রামাঞ্চলে এটা সুস্পষ্ট যে এখন অনেক শহরগামী পুত্র বা কন্যা পিতামাতার খোঁজ নিতে চান না এবং সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেন না। অন্যথায়, সাধারণত গ্রামাঞ্চলে যদি পিতামাতা অন্তত একজন সন্তান বা নিকট আত্মীয়ের সাথে বাস করেন, এখনও সে সন্তান বা নিকট আত্মীয় নিজের ইচ্ছায় বা সামাজিক চাপে তাঁদের দেখাশোনা করার দায়িত্বভার নিয়ে থাকেন।

স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি

শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে মনে হয় মানুষের লোভ এবং বিরাট ধনী হওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে। পিতামাতা অথবা ভাইবোনরা তাঁদের চতুর শিক্ষিত স্বজনের শিকার হচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ ছলচাতুরি করে জমিজমা ও ঘরবাড়ি দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের সাহায্যে লিখে নিয়ে বৃদ্ধ পিতামাতাকে পথে বসাচ্ছেন। ভাইবোনদের প্রাপ্য অংশ হাতিয়ে নিচ্ছেন। জবর দখলকারী আত্মীয়রাও এসব করেন।

এরচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হ'ল, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক, প্রশাসন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শত রকম অনিয়ম ও দুর্নীতি ঢুকেছে এবং ঢুকছে। উদাহরণ স্বরূপ, ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল ঔষধ প্রায় সর্বত্র নির্বিঘ্নে বিক্রয় হয়। কোন কোন আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে অর্থ গ্রহণ করে। তারপর দেখা গেছে, জালিয়াতচক্র ভুয়ো দেশী ও বিদেশী কম্পানি, শেয়ার বাজার ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নানা ফন্দির দ্বারা হাজার কোটি টাকা উধাও করতে সক্ষম হন। এসব ছোট, বড় জালিয়াতির ফাঁদে পড়ে সরল সাধারণ মানুষ অর্থ বিনিয়োগ করতে গিয়ে ফতুর হচ্ছেন। প্রশাসনে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁরা জনসেবক না হয়ে কীভাবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধিলাভ হয় তার চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও মেধা-ভিত্তিক না হওয়াতে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়। স্বভাবতই, এই শিক্ষকরা শিক্ষাদানকে তত গুরুত্ব দেন না।

দলাদলি ও কোন্দল

এখানে দলাদলি বলতে শুধু এক রাজনৈতিক দল অন্য আর একটি দলের প্রতি মত বা নীতি নিয়ে বিরোধিতার সম্পর্ক বোঝায় না। এক্ষেত্রে, দেশের দলগুলোর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত সহিংস নানারকম তুলকালাম ব্যাপার অহরহ ঘটে। শহরের একটি ছোট পল্লী বা গ্রামের মানুষরা যখন জোট বেঁধে দলাদলি করে এবং অহেতুক কোন্দলে লিপ্ত হয় সেটা সভ্য সমাজের জন্য কাম্য হতে পারে না।

বিদেশের বাঙালি সমাজেও এসব ঘটছে। সেখানে এরকম মেরুকরণ বাঙালি সমাজকে অন্যান্যদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে আমাদের সমাজের হয়তো এই অবস্থা হতো না।

উপরের বিষয়-ভিত্তিক আচরণগুলি বাঙালি সমাজের অবক্ষয় অথবা অপসংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হোক এটাই কামনা করি। যদি পারিবারিক কাঠামো এবং সামাজিক কাঠামো উন্নত রাখতে না পারি, তাহলে আমাদের সমাজ বা দেশকে সুস্থ বা সুসভ্য বলতে পারি না আমরা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে যেসব অপসংস্কৃতি বিদ্যমান, একদিন নিশ্চয়ই তার অবসান ঘটবে।

মুণ্ডাজোড়া ম্যাঙ্গানিজ মাইনস

অলোক কুমার চক্রবর্তী

পর্ব: ১

- **"এ** কার্তিকওয়া! ইধর পানি দে না রে | অওর জলেবি এক পিলেট, অগর গরম হোহি তো!"

- "হেই কার্তিকঅ, এঠি দুইটা সিঙ্গড়া দেলু রে!"

- "অ্যাই কার্তিক! তিন নম্বরের খালি গ্লাস-প্লেট সরা | আর চা দিবি দু'টো।"

নানা ভাষার হৈ-হট্টগোলে, পাঁচমিশেলি ফরমায়েশে আর আওয়াজে সকালবেলার এই টিফিন টাইমে জমজমাট কেডিয়া কম্পানির মুণ্ডাজোড়া ম্যাঙ্গানিজ মাইনসের ক্যান্টিন | আর একমাথা ঝাঁকড়াচুলো, ফর্সা, রোগা পাতলা চেহারার বছর বারো-তেরোর কার্তিক এই টেবিলে ওই টেবিলে দৌড়ে দৌড়ে দু'হাতে দশ হাতের কাজ সামলাচ্ছে | প্রচণ্ড চাপ এই সকালবেলাটায় | ক্যান্টিন মালিক সুচাঁদ ব্যানার্জিও টাকাপয়সা লেনদেনের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু কাজ করে দিচ্ছে বটে, তবে আসল তো কার্তিকই | সে না খাটলে সুচাঁদের দু'টো পয়সা আসবে কোত্থেকে? সব কাস্টমারকে খুশি রাখতে হবে তো!

এদিকে তখন ওয়েল্ডার মৈথিলি মানুষ রামশরণ দুবেজী শোভেল অপারেটর দত্তবাবু আর কম্প্রেসার মেকানিক দেওরাও বাগড়েকে বলছেন, "সমঝে ন, রামচরিতমানস মে ওহি বাত তুলসিদাসজী কহিছন..." বলতে বলতে দোঁহা আবৃত্তির জন্য যেই ডানহাতটি মেলে ধরেছেন, একসঙ্গে তিন-চারটে প্লেটে সিঙ্গাড়া, জিলিপি, ঘুগনি, সেইসঙ্গে জলের গ্লাস নিয়ে তাড়াহুড়ো করে আসতে থাকা কার্তিক খেল এক সজোর ধাক্কা দুবেজীর বাড়ানো হাতের সঙ্গে | অমনি 'ঝন্-ন্-ন্, কড়াক-ঠং' – নানা আওয়াজ আর "গেল রে, সব গেল, হতচ্ছাড়া" চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসল কার্তিক, ক্যান্টিনের বারান্দায় সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চের ওপর | দু'হাতে চোখ রগড়ে হতভম্বের মতো বসে রইল | কোথায় লোকজন, ভিড়-ভারাক্কা, সকালবেলার হট্টগোল – এখন তো দুপুর প্রায় – শুনশান চারিদিক! ক্যান্টিনের দরজার দিকে তাকাল, একটা বড়সড়ো তালা ঝুলছে সেখানে | সুচাঁদ ক্যান্টিনের ব্যবসাতে লোকসানে ডুবে সব বন্ধ করে দিয়ে রওনা দিয়েছে তার দেশের বাড়ি, বাঁকুড়ায় | আর নিষ্কর্মা বসে থেকে থেকে ক্যান্টিনের বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছিল সদ্য 'ভূতপূর্ব' ক্যান্টিনবয় কার্তিক মুখার্জি |

হোলি তার রং ছড়িয়ে, মাটিতে দেয়ালে নানা নকশার ছাপ রেখে বিদায় নিয়েছে ক'দিন আগেই | একটা মনকেমন করা হাওয়া এলোমেলো বয়ে চলেছে কার্তিকের বিক্ষিপ্ত মনটার মতোই | রাস্তা থেকে ক্যান্টিনে ঢোকার পথটির মুখে দু'পাশে দুই অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়ানো একটা শাল আর একটা মহুয়া গাছ থেকে ঝরেপড়া ফুলের গুঁড়ো আর শুকনো পাতায় ভরে আছে বারান্দাটা | অলস বিহ্বলতায় কার্তিক তাকাল সামনের রাস্তাটার দিকে – সেখানকার মোড় থেকে বাঁদিকের রাস্তা ধরে 'বারোপঞ্চাশ' চলে গেল ল্যাটেরাইটের লাল ধুলো উড়িয়ে, বোধহয় 'চম্পা খাদান' বা 'কারিয়া খাদানের' দিকে লোড নিতে | হ্যাঁ, এখানে চলাফেরা করা সব গাড়িরই, তা কম্পানির হোক বা ঠিকাদারদের, এরকমই নম্বর দিয়ে নাম রাখা | সবাই চেহারাতেই চিনে নেয়, কিংবা পিঠে বসে থাকা কুলি-রেজাদের (মহিলা শ্রমিক, বেশিরভাগই আদিবাসী) দেখেই | নম্বরপ্লেট দেখার দরকার হয় না | যেমন, মাইনস ম্যানেজারের জিপকে বলে 'তিরপনসোলা' (তিপ্পান্নষোলো, অর্থাৎ ORJ-5316)!

ঝাড়খণ্ড সীমানার কাছ ঘেঁষে উত্তর ওড়িশার ঘন জঙ্গলভরা কেওনঝড় জেলার প্রায় পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অজস্র লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ আকরের খনির মধ্যে একটি এই 'মুণ্ডাজোড়া ম্যাঙ্গানিজ মাইনস' – এক গহন প্রত্যন্তে, চারিদিক পাহাড়ি নালায় ঘেরা, হাজার দুয়েক ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথা জুড়ে সাজানো | আকরিক লোহা আর ল্যাটেরাইটের কারণে এখানে মাটির রঙ সর্বত্রই লাল | আর তাতে গাঢ় সবুজ পাতা নিয়ে শাল, পিয়াশাল, মহুয়া, হরিতকি, বয়ড়া, অর্জুন, কুসুম, করম ইত্যাদি বড় বড় গাছের সঙ্গে চিহড়, কুর্চি, নাড়ালতা, অনন্ত, করঞ্জ ইত্যাদি নানা লতার জঙ্গল | আছে বুনো হলুদ, ভাট, বনতুলসির ঝোপ ও তাদের মাতিয়ে দেওয়া তীব্র বুনো গন্ধ | আর সবুজেরও কত প্রকারভেদ! সব মিলিয়ে লাল-সবুজে এক অপূর্ব রংবাহার | তার মধ্যে গাছে ফুল ধরলে, বা নতুন পাতার সময় এলে তো আরও বাহারি! যেমন এখন – শাল-মহুয়া-পিয়াশালের কচি সবুজ পাতা, কুসুমের গাঢ় খয়েরি, আর অর্জুন লালে লাল |

পুবদিক থেকে নীচের মুণ্ডাজোড়া নালা পার হতেই

বাঁহাতে পর পর 'বেল হাটিং', 'বর্মা হাটিং' ইত্যাদি নানা নামের 'লেবার হাটিং' বা শ্রমিক বস্তি (লাইন)| এই হাটিংগুলো খাদান থেকে বা এদিক সেদিক থেকে আনা ল্যাটেরিটিক বোল্ডার কাদামাটি দিয়ে গেঁথে, দেয়ালে খাদানের নরম কাদাপাথর বা Soft Clayey Shale জলে গুলে লেপে দেওয়া | শ্রমিকপিছু রান্নাঘরসহ এককামরার ঘরের টানা ব্যারাক | ওপরে জি.আই. শিটের ছাউনি | সবাই নিজের ঘরটুকুর সামনে একটু করে ঘিরে ছাগল-মুরগির খাঁচা, চালে বাইয়ে দেওয়া লাউ বা লতা, দু-চারটে ডাঁটা গাছ করে রেখেছে | কেউ ঘরের পিছনে একটু মকাই বা শাকের ক্ষেত করেছে | চওড়া মোরামপথে খাড়া অনেকটা উঠে এলে বাঁহাতে 'ছোটা সাহেব হাটিং' ও ডাইনে 'বড়া সাহেব হাটিং'| ছোটা সাহেব হাটিং শেষ হতেই দু-চারটে মুদিখানা ও মণিহারি দোকান, চা-জলখাবারের স্টল, সাহুর পান দোকান, নাক্কুর পাইস হোটেল – সবই নিম্নমানের, আদিবাসী শ্রমিকদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের উপযোগী | এরপরই কম্পানির নাম লেখা তোরণ ও চেকগেট পেরিয়ে এবং ডানদিকের বড়া সাহেব হাটিংয়ের টানা ব্যারাকের উল্টোদিকে রাস্তার বাঁয়ে একটু উঁচুর দিকে উঠে যাওয়া মাইনসের অফিস ক্যাম্পাস | ক্লেয়ী শেলে রঙকরা বোল্ডারে গাঁথা পাঁচিলের ভেতরে বিশাল লোহার গেট দিয়ে ঢুকে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ছাড়াও রয়েছে জেনারেটর রুম, কম্প্রেসার রুম, গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ, কিছু স্টাফ কোয়ার্টার্স, ব্যাচেলরর্স মেস ইত্যাদি | কয়েকটি বিশাল আম, কাঁঠাল, মহুয়া গাছও রয়েছে | অফিসের গেট ছাড়িয়ে এগিয়ে এলেই দেখা যাবে গাছগাছালিতে ঢাকা জমি পুব-দক্ষিণের উঁচু থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণে অল্প ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেকটা জুড়ে | রঙ করে বোল্ডার দিয়ে সীমানা করা রাস্তা ভাগ ভাগ হয়ে চলে গেছে নানা দিকে | অফিসের উল্টোদিকের বড়া সাহেব হাটিং টানা এসে শেষ হতে একটা তেমাথা | এখানে ওই ডানহাতেই রাস্তা থেকে একটু ভেতর দিকে ক্যান্টিন | তেমাথা থেকে একটা রাস্তা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে শিবমন্দির, হনুমান মন্দির পার হয়ে পাহাড়ের মধ্য ও দক্ষিণভাগের একগাদা খোলামুখ খাদানের দিকে চলে গেছে | আর পশ্চিমমুখো রাস্তাটা দিয়ে সোজা এগিয়ে এলে মাঝখানে ভলিবল কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু মহুয়া ও শালগাছ আর কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে রেখে তিনটে শাখায় ভাগ হয়ে গেছে | দুই প্রান্তের রাস্তা বরাবর নেমে গেছে পদমর্যাদা অনুযায়ী নানা ধাঁচের বাংলো ও কোয়ার্টার্স, বাঁদিকে একদম শেষে খাদের ধারে মনোরম গেস্ট হাউস | ডানপ্রান্তের রাস্তাটি কোয়ার্টার্সের লাইন পার করে নীচে নেমে গেছে পাম্প হাউস হয়ে, ঝর্ণা পেরিয়ে আদিবাসী গ্রামগুলোর দিকে | আর মাঝের রাস্তাটি সোজা গিয়ে ঠেকেছে ছোট্ট হাসপাতাল আর তার লাগোয়া ডাক্তারের বাংলোতে | প্রায় সব কোয়ার্টারেরই সামনে-পিছনে বাগান |

*****

পর্ব: ২

নানা প্রদেশের নানাজাতের লোক আছে এখানে | মারোয়াড়ি কম্পানি মাইনে দেয় অত্যন্ত কম | তবু যে কী করে এত দূর দূরান্তের লোক এখানে এসে পৌঁছেছে এবং মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে বছরের পর বছর, তা ভাবলে অবাক লাগে | আসলে এক আশ্চর্য মোহময় মাদকতা আছে এই জঙ্গলভূমির | এখানে বেশ কিছু লোক এমন আছে, যাদের শহরে বা দেশ গাঁয়ে স্ত্রী-সন্তান-পরিজন রয়েছে | কিন্তু এই গহন প্রত্যন্তের বনভূমিতে এসে এখানকার আদিম বন্য মাদকতায় মোহাবিষ্ট হয়ে, এই নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত নির্লিপ্তি ছেড়ে মন ফিরে যেতে চায়নি ফেলে আসা শহুরে কোলাহল বা গ্রাম্য জটিলতাময় জীবনে | কেউ কেউ কোনো বনবালাকে সঙ্গিনী করে নিয়ে এখানেই সংসার পেতে বসেছে |

এই কার্তিকের পদবি 'মুখার্জি' বলে ওকে সবাই বাঙালি ভাবে | কিন্তু ও জানে ওরা ওড়িয়া | ওদের এক পূর্বপুরুষ বাংলা থেকে ওড়িশায় এসে থেকে গিয়েছিলেন | তারপর পরবর্তী প্রজন্ম বংশানুক্রমে স্থানীয় ওড়িয়া মেয়ে বিয়ে করে এবং সেই সমাজে থেকে তাদের রীতিনীতি ও আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওড়িয়াদের মতোই হয়ে গেছেন | কার্তিকের বাবা দীননাথও কম বয়সে বিয়ের পর দু'টি ছেলেমেয়ে রেখে ভাগ্যান্বেষণে বার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই খনি উপনিবেশে এসে থিতু হয়ে যায় | ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে এখানে কম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় চলা মন্দির দু'টির পূজারীর দায়িত্ব আর বাকি সময় সাইট স্টোর হেল্পারের কাজ পেয়ে যায় | নতুন সংসারও পেতে নিয়েছে এখানেই এক বনবালাকে বিয়ে করে, ভুলে গেছে পুরনো সংসার | কার্তিক, তার দাদা নীলাকর আর ওদের দুই বোন এই আদিবাসী মায়েরই সন্তান | দীননাথ মদের নেশাতেই তার আয়ের বেশিরভাগটা

শেষ করে দেয় | তাই বাধ্য হয়েই নীলাকর আর কার্তিককে পাশের পাহাড়ের গুরুডা মাইনস প্রাইমারি স্কুলের পড়া ছেড়ে কাজ খুঁজে নিতে হয়েছে | এখানেই যে সরকারী বোরিং ডিপার্টমেন্টের ক্যাম্প আছে, তার দক্ষিণ ভারতীয় প্রজেক্ট ম্যানেজারের ঘরে রান্নাসহ সমস্ত কাজ করে নীলাকর, মোটামুটি ভাল টাকাই পায়, অন্তত ওদের হিসেবে| কার্তিকও আগে ফাই-ফরমায়েশের কাজ করত হাসপাতালের বাঙালি ডাক্তার সাহেবের বাংলোয় | বয়স্ক মানুষ ডাক্তার ঘোষালকে ও ডাকে 'সাহেব' আর তাঁর স্ত্রীকে 'মা'| নিজের মাকে অবশ্য ওরা ওড়িয়া রীতিতে 'বৌ' বলেই ডাকে | ওই ডাক্তার-মা কার্তিককে ভালবাসেন খুব | কার্তিক ওঁর কাছে কাজ করলেও উনি বুঝিয়েছেন, "দেখ কার্তিক, লোকের বাড়ি কাজ করে কি চিরদিন চলে, না বড় হওয়া যায়? তুই আমার কাছে আছিস ঠিক আছে, কিন্তু অন্য কিছু খুঁজে নিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করবি | লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে ড্রাইভিং নয়তো মেকানিকের কাজ শিখে নিতে চেষ্টা করবি|" সুচাঁদ যখন ক্যান্টিনের কন্ট্রাক্টরি পেল, তখন এই ডাক্তার-মা'ই সুচাঁদকে বলে কার্তিককে ক্যান্টিনের কাজে লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন|

ক্যান্টিনটা নামেই কম্পানির ক্যান্টিন | আসলে শুধু আইন বাঁচানোর জন্য 'মাইনস অ্যাক্ট'-এর ধারা অনুযায়ী বজায় রাখা | খাতায় কলমে অনেক ভর্তুকি দেখানো থাকলেও বস্তুত এই ক্যান্টিনবাড়িটা, ইলেক্ট্রিক খরচ আর জ্বালানি কাঠ কম্পানিই দেয়, আর দেয় কুক বাবদ নামমাত্র একটা টাকা | ক্যান্টিনবাড়ির তো আলাদা খরচ নেই, আর কম্পানির দৈত্যাকার দু'টো সার্দিংটন ও দু'টো ওয়েসম্যান জেনারেটর তো চব্বিশ ঘন্টাই পালা করে চলছে – কাজেই বিদ্যুতের কোনো আলাদা খরচ কম্পানির নেই | তবু ক্যান্টিন চালাতে এই দরকারি খরচগুলো বেঁচে যায় বলে বাইরের হোটেলের চেয়ে খাবারের দাম কিছুটা কম পড়ে বৈকি! তার ওপর চেষ্টা থাকলে একটু পরিচ্ছন্ন পরিষেবাও দেওয়া যায়| তার জন্য ভদ্রলোক খদ্দেররা এখানেই আসেন | এছাড়া বোরিং ক্যাম্পের লোকেরাও আছে | কিন্তু রেজা-কুলিরা ভাল খাবারের লোভে কিছু কিছু এখানে এলেও অনেকেই 'নাক্কু'-র হোটেলে বা 'গুড্ডু'-র টি স্টলে ধারের খাতায় নাম লিখিয়ে বরাবরের জন্য বাঁধা পড়ে যায় | কিন্তু এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুচাঁদ ক্যান্টিনটা চালাতে পারল না শুধু নিজের দোষে| প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে কার্তিকের সুচাঁদের ওপর|

সুচাঁদের বাবা বুড়ো ব্যানার্জিবাবু এখানে সবচেয়ে প্রবীণ 'মাইনস ফোরম্যান'| হাড় জিরজিরে চেহারা | কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রমী | অল্প বয়েসেই বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বার হয়ে এসেছিলেন কিছুটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, আর কিছুটা ভাগ্যান্বেষণে | সেকালের ম্যাট্রিক পাস, ফলে কিছু লেখাপড়ার কাজ ও কুলিসর্দারির কাজ মোটামুটি সহজেই পেয়ে গিয়েছিলেন এই জঙ্গলমহলে | ধীরে ধীরে খনি অধিনিয়মের নানা পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে, একটার পর একটা ধাপ পার হয়ে মাইনস ফোরম্যানের সার্টিফিকেট পেয়েছেন | তিনটি চাকরি বদলে এই মুণ্ডাজোড়া ম্যাঙ্গানিজ মাইনসে থিতু হয়েছেন তাও আজ ত্রিশ বছর হয়ে গেল | সবাই খুব ভালবাসে ও সম্মান করে ব্যানার্জিবুড়াকে | কিন্তু ছেলে সুচাঁদ একেবারে বিপরীত | বাপের অন্ন ধ্বংস করে সারাদিন গাঁয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ানো আর গুলতানি – এই করেই দিন কাটে | সুচাঁদ রমণীমোহনও বটে |

ছেলেকে সুপথে আনতে ব্যানার্জিবাবু চাইবাসায় কম্পানির হেড অফিসে ছোট মালিক কেশবলাল কেডিয়াকে ধরে ওর জন্য ক্যান্টিন কন্ট্রাক্টরের কাজ জুটিয়ে এনে দিলেন | কিন্তু হলে হবে কী? সুচাঁদ ব্যবসাক্ষেত্রে একদম দিলদরিয়া | এমনিতে ও খুবই সরল | ওর মাথায় কাঁঠাল ভাঙা খুবই সহজ | অল্পদিনেই তা বুঝে যায় এখানকার ধুরন্ধর কিছু লোক আর খাদানের কিছু রঙ্গী-ঢঙ্গী রেজার দল | সুচাঁদের 'চওড়া দিল' ও বন্ধুদের জন্য সদা-উপকারী মনের প্রশংসা করে তারা আরামসে খেয়ে যায় | পাঁচটা খেলে দু'টো হিসেবে চড়ে, বাকি নিপাত্তা | ছলাকলা পারদর্শী চপল, চটুল কিছু রেজা শেষ বিকেলে খাদান থেকে ফেরার সময় নালায় স্নান করে এসে ঢোকে ক্যান্টিনে বাড়ি যাওয়ার পথে | একটু রঙ্গ রসিকতা, হাসি, একটু ছোঁয়াছুঁয়ি উদ্দাম যৌবনের | ব্যস! কী হিসাব হ'ল, কী হ'ল কে জানে? দেখা যায় সুচাঁদের মালও পড়ে নেই, ক্যাশবাক্সে টাকাও পড়ে নেই |

রবিবার এখানে হপ্তার পেমেন্ট হয় কম্পানির এবং ঠিকাদারদের সমস্ত কুলি-রেজাদের জন্য| সেদিন এখানে অর্ধেক দিন কাজ হয়ে ছুটি | একটা ছোট হাট বসে অফিস ক্যাম্পাস আর মন্দিরগুলোর পেছনে মহুয়া গাছগুলির তলায় | নীচের হাণ্ডিভাঙা, কালাটাঙ্গর, জোড়শিলা ইত্যাদি গ্রামগুলো থেকে

কিছু পসরা নিয়ে আসে স্থানীয় মানুষেরা; নিজেদের ঘরোয়া উৎপাদন – সব্জি, চাল, সর্ষে, তিল, বাজরা, পাহাড়ি নালায় ধরা ছোট মাছ, ঘরে তৈরি গুলগুল্লা, সেদ্ধ রাঙাআলু ইত্যাদি। ডিম, মুরগি, এক আধটা ছাগল, পাঁঠাও আনে কখনো সখনো। ময়ূরের ডিমও প্রায়ই আসে। শহর থেকে ব্যাপারীরা আসে গাড়ি বোঝাই করে নানা সম্ভার নিয়ে। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতি, বাসন, নানা প্রসাধনী, জামাকাপড়, জুতো-চপ্পল – কী নয়? সেই সঙ্গে থাকে 'হাব্বা-ডাব্বা', 'ঘুরণ চাক্কি' ইত্যাদি নানাবিধ জুয়ার আসর। আর সবার ওপর আছে চানা-চাট ও পিঁপড়ের ডিমের চাটের সঙ্গে হাঁড়িয়া – ভাত পচিয়ে তৈরি দিশী মদ – যা এদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রান্তিক মানুষগুলোর এতে কিছুটা পেটও ভরে, নেশাও হয়। একটু লুকিয়ে মহুয়ার মদও থাকে। আর এক আধটা মোরগ লড়াই। সেও এক দারুণ উত্তেজনার খোরাক মরদদের জন্য।

খাদান হাফ ছুটির পরই সবাই নালায় স্নান সেরে এসে কম্পানির ক্যাশিয়ার হেমব্রমবাবুর কাছে অথবা ঠিকাদারের মুনশির কাছে লাইন দিয়ে 'টিপ্পা' (টিপসই) লাগিয়ে টাকা নিয়েই দৌড় দেয় হাটের দিকে হাসি আর হুল্লোড়ে মেতে। পুরো সপ্তাহের খাটুনির পর এই হাটে যাওয়াটা ওদের কাছে উৎসব। রবিবারেরটা ওদের ছোট উৎসব, বড়টা তোলা থাকে সোমবারের 'বামেবাড়ি হাটে'র জন্য। চারটে পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হয়। সেজন্য সোমবার এখানে পুরো ছুটি।

*****

পর্ব: ৩

রবিবারে এখানে 'হপ্তা-পেমেন্ট' হয় বলে ক্যান্টিনের বিক্রিবাটাও একটু বেশি হয় বিকেল, সন্ধ্যায়। জিনিস বেশি করে তৈরি করানো হয়। কিন্তু হলে হবে কী? রেজা-কুলিগুলো হাঁড়িয়া চড়িয়ে উচ্ছল-উদ্দাম হয়ে ঢোকে সুচাঁদের ক্যান্টিনে। ওকে ওরা একেবারে বশ করে ফেলে। কার্তিক এসব দু'চোখে দেখতে পারে না। ঝগড়াঝাঁটি করে যতটা সম্ভব পয়সা আদায় করার চেষ্টা করে ও। কিন্তু তাও পুরো পেরে ওঠে না ওদের প্রতি সুচাঁদের প্রশ্রয়ে। কার্তিক জানে, এদের কাছে খাবার দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পয়সা করে নিতে হবে। না হলেই সব হিসেব গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। নেশার ঝোঁকে ভুলে যাবে কী কী খেয়েছে, তারপর ঝগড়া, নালিশ সুচাঁদের কাছে – পারলে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। আর সুচাঁদও প্রশ্রয়ের হাসিতে নিরস্ত করবে কার্তিককে, "এ কার্তিকঅ, ছাড়ি দে ম। মু তাহার ঠারু নেই নেইবি। মু হিসাবঅ রখুছি পরা!" ব্যস, ওদেরও পোয়া বারো।

- "মালিকঅ কহি দেলা, তু কিয়ে ম?" আর বিশেষত কুলিরা পাওনাদারের ধার মিটিয়ে, তারপর জুয়ায় আরও পয়সা হেরে গেলে নেশা চড়ায় বেশি ক্ষোভ ভুলতে। তখন আর চালু ওড়িয়া ভাষাও মুখে আসে না। হো ভাষায় সোজাসাপ্টা জবাব, "পোইসা বানুয়া" (টাকা নেই), অথচ খাবার খেয়ে নিয়েছে একগাদা প্রথমে "পোইসা মিনা, পোইসা মিনা", মানে "আছে" বলে দাঁত বার করে সরল হাসবে আর নিজস্ব ভাষায় বিড়বিড় করে বকে যাবে। রাগে জ্বলতে থাকে কার্তিকের সারা শরীর। এভাবে চলবে কী করে?

ব্যানার্জিবুড়া এতসব জানেন না। ছেলের ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য সমানে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন। কার্তিক একদিন সোজা ব্যানার্জিবাবুকে বলে দিল, "এ বুঢ়াবাপা, তোরঅ পুঅকু সম্ভাল টিকে। সিয়ে সব্বু পইসা রেজামানঙ্কর পছে ঢালি দেউছন যে!"

সবিস্তারে তাঁকে বলতেই তিনি তো রেগেমেগে তখনই ক্যান্টিন বন্ধ করে দিতে চাইছিলেন। শেষে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাঁকে তখনকার মতো নিরস্ত করা গেছে। সুচাঁদ পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে, শুধরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্যান্টিন চালু রাখতে পেরেছে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কথা। ক'দিন পরেই এল হোলি। আর তখন তো এইসব খনি এলাকায় 'মহোৎসব'! ঠিকাদারদের পৃষ্ঠপোষণায় তখন দিশী-বিলিতি নানারকম মদ, মহুয়া আর হাঁড়িয়ার ফোয়ারা ছোটে। এমনিতে সব ছুটি থাকলেও খাদানে সব রেজা এবং অল্প কিছু কুলির (লোক দেখানো) জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় 'বিশেষ হাজিরা'। অফুরন্ত মহুয়ার মদ আর হাঁড়িয়া ইত্যাদি ছাড়াও দুপুরে মাংসভাত আর কিছু 'স্পেশ্যাল অ্যালাওয়েন্স'। বিনিময়ে রঙ খেলার নামে তুমুল হুল্লোড়, নষ্টামি, বেলেল্লাপনা, মাতলামো – রেজারা হ'ল খোরাক! এসব সেই ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলের অভ্যাসেই দাপটে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দুর্বলচিত্ত সুচাঁদের ক্ষমতা ছিল না এই স্রোতের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার। তাই আবারও ভেসে গেল সে। বেশি বিক্রির আশায় হোলির দিন অনেক খাবার তৈরি করানো হয়েছিল। সুচাঁদ এমনিতে নেশাড়ু না হলেও এই উৎসবের দিনে

সবার অনুরোধ-উপরোধে, বিশেষ করে কিছু উদ্দাম-যৌবনা, চপল-চটুল রেজাদের গলা জড়িয়ে বা জাপটে ধরে আবদারে একটু আধটু কখনো হাঁড়িয়া, কখনো মহুয়া বা অন্য মদ নিতে নিতে সন্ধ্যার পর একেবারে বেসামাল সব কিছুর মিশ্র বিক্রিয়ায়। আর সেই সুযোগে প্রায় লুঠ হওয়ার মতো ক্যান্টিনের সমস্ত তৈরি খাবার দাবার যেন উড়ে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল কার্তিক ক্যান্টিন-কুক পটল সাহুকে নিয়ে ঠেকাতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেনি। মালিকের নিজের হুঁশ না থাকলে কি আর হয়? সব শেষ হয়ে যেতে কার্তিক হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে দৌড়ল ব্যানার্জিবুড়াকে সব জানাতে। সে যে আপ্রাণ ভালবেসেছিল এই ক্যান্টিনটাকে আর তার নিজের কাজকে। এভাবে সব নষ্ট করে দেওয়াটা তাই সে মেনে নিতে পারেনি।

ব্যানার্জিবাবু সব শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেই সন্ধ্যাতেই ছুটে এসে একটা শালের ডান্ডা তুলে নিয়ে প্রথমে তো বেধড়ক পেটালেন বেহুঁশ সুচাঁদকে। তারপর সমস্ত জিনিসপত্র, বাসন ইত্যাদি কার্তিক আর পটলের সাহায্য নিয়ে রাতেই নিজের কোয়ার্টারে পার করে তালা মেরে দিলেন ক্যান্টিনের দরজায়। সকালে চাবি জমা করে দেবেন ওয়েলফেয়ার অফিসার জর্জ পি কে বোসের কাছে। কার্তিক ওর দাদা নীলাকর, পটল ও আরো দুই বন্ধুকে নিয়ে ব্যানার্জিবুড়ার আপত্তিতে কান না দিয়ে সুচাঁদকে ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে এল তাঁর কোয়ার্টারে। আর কার্তিকের কাছে তারপর থেকে সবকিছু যেন শূন্য হয়ে গেল।

দু'টো দিন ঘোরের মধ্যে কেটেছে কার্তিকের। কী করেছে, কী খেয়েছে, কিংবা খায়নি – কিছুই জানে না। নিজেদের ঘরে তো ফিরতেই ইচ্ছে হয়নি। একদিন একজন বলছিল – ছোটদের নাকি কাজ করা মানা। পুলিশে ধরবে জানতে পারলে। হুঁঃ! পুলিশ তাহলে ওর বাবার মদ খাওয়া বন্ধ করুক না! তাহলে তো কার্তিক আবার ইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে পারে, বড় হয়ে চাকরি করতে শহরে চলে যেতে পারে!

আজ সকাল ন'টা নাগাদ ম্যাঙ্গানিজ ওর নিয়ে যাওয়া 'বাইশপঁচিশ' ট্রাকে সুচাঁদকে তার মালপত্র সমেত তুলে দিয়ে হতাশায় আরও ডুবে গিয়ে কার্তিক ক্যান্টিনের বারান্দায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সিমেন্টের বাঁধানো সিটে! সুচাঁদের মুখটা মনে পড়ল ওর। যাওয়ার সময় চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল, "তুই অনেক চেষ্টা করেছিলি রে, কার্তিক! আমিই পারলাম না। এখন আমি সব বুঝতে পারছি নিজের দোষগুলো। নিজের ভেতর থেকেই বুঝতে পারছি আমি এবার শুধরে যাচ্ছি। কিন্তু আর বলবার মতো মুখ নেই আমার। তোর কথা আগে ঠিকভাবে শুনলে এমন হতো না। সবই আমার দোষ। তুই চেষ্টা কর অন্য কিছু করতে। আমি তো তোকেও ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম রে। পারিস তো ক্ষমা করে দিস।"

কার্তিক কঠিন মুখ করে শুধু শুনে গেছে।

ওদিকে 'মেইন এক নম্বর খাদান', যেটা ফোরম্যান ব্যানার্জিবুড়ার চার্জে আছে, সেখান থেকে হাত-চোঙায় ব্যানার্জিবুড়ার আবছা হাঁক শোনা গেল, "খাদান ছুট্টি হো-ও-ও-ও খাদানিয়া", আর তাই শুনে সাইটের অফিস থেকে কেউ 'নিউম্যাটিক সাইরেন'-এর হাতল ঘুরিয়ে আওয়াজ তুলে দিল 'পোঁ-ও-ও-ও' করে। সাড়ে বারোটা বাজল। মাইনসের টিফিনের ছুটি দেড় ঘন্টার। এই ফাঁকে ব্লাস্টাররা ডিনামাইট দিয়ে ব্লাস্টিংগুলো সেরে ফেলবে। কালচে নীল ম্যাঙ্গানিজ আকরসহ লাল ল্যাটেরিটিক পাথরগুলো এক-একটা ব্লাস্টিং-এ ছিটকে ছিটকে উঠবে ওপরদিকে টুকরো টুকরো হয়ে, সঙ্গে লাল-সাদা -নীল-হলুদ নানা রঙের শেল বা নরম পাথরের ধুলো নিয়ে। তারপর ছড়িয়ে পড়বে বৃষ্টির মতো অনেকটা জায়গা জুড়ে। এইসময়ে বিপদ এড়াতে ধারেকাছে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।

একটা ঘোরের মধ্যে কার্তিক ক্যান্টিনের বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় উঠে ডানদিকে ঘুরে অলসভাবে হাঁটতে লাগল তিনটে রাস্তার মাঝেরটা ধরে। রাস্তাটা সোজা গিয়ে প্রথম যেখানে ধাক্কা খেয়ে আবার ডানদিকে ফিরছে, সেই মাথাটাতেই আছে তিনটে শাল, তিনটে মহুয়া আর মাঝে একটা চাঁপা গাছ দিয়ে ঘেরা হাসপাতাল আর তার লাগোয়া ডাক্তার ঘোষালের বাংলো। ওখানেই তো আছে তার নির্বিকার আশ্রয়স্থল 'ডাক্তার-মা', বিপদে আপদে কার্তিক তো সেখানেই ছুটে গেছে। আজও অবচেতনে তার পা চলতে শুরু করেছে সেদিকে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেল কার্তিক, ডাক্তার-মা'র কথাগুলো ওর কানে বেজে উঠল, "কখনো পিছন দিকে ফিরে আসবি না কার্তিক। শুধু সামনে তাকাবি। ভুল শুধরে আবার এগোবি। নিজের পা মাটিতে

রেখে, নিজের ক্ষমতায় খেটে খাবি। অন্যের দয়ায় নয়।"

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওর। সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরে ও কম্পানির এলাকায় ঢোকা-বেরনোর চেকগেটের দিকে পা চালাল জোর কদমে। এখনও সময় আছে। সুচাঁদ তো ট্রান্সপোর্টের ট্রাকে বাঁশপানি সাইডিং-এ পৌঁছে এখন বসে থাকবে চারটের 'বামেবাড়ি-বড়াজামদা' বাসের অপেক্ষায়। বড়াজামদা থেকে ও ছ'টার ট্রেন ধরে টাটানগর হয়ে বাঁকুড়ায় যাবে – কার্তিক জানে। এখনই কোনো ট্রাক ধরতে পারলে বড়াজামদার বাস পৌঁছনোর আগেই ও বাঁশপানি সাইডিং-এ পৌঁছে সুচাঁদকে ধরতে পারবে। কার্তিক সুচাঁদকে ফিরিয়ে আনবেই যেভাবে হোক। তারপর ওর 'বুঢ়াবাপা' ব্যানার্জিবুড়াকে কার্তিক হাতে-পায়ে ধরে রাজি করাবে আবার ক্যান্টিন খোলাতে। এবার সব দায়িত্ব কার্তিক নেবে সুচাঁদকে সামনে রেখে। রোজকার হিসেব ও রিপোর্ট ও নিজে ব্যানার্জিবুড়াকে দেবে যাতে কোনো বেচাল হতে না পারে। কার্তিক হেরে গিয়ে ছেড়ে দেবে না।

চেকগেটে খবর পেল 'আঠারাছত্তিস' লোড নিতে গেছে নীচের পনসগুড়া খাদানে, ঘন্টা দেড়েক আগে। 'লোডিং এগজিট স্লিপ' আগেই কাটিয়ে নিয়ে গেছে। ট্রাক লোড হলে ওপাশ দিয়েই নালা পার হয়ে বেরিয়ে যাবে ব্লাস্টিং শুরু হওয়ার আগে। একটা ট্রাক লোডিং করতে পুরো দু'ঘন্টা সময় নেয়। মানে এখনও কিছুটা সময় আছে। তাছাড়া, স্লিপ কাটাতে এদিকে আসবে না, অর্থাৎ সময়ও বাঁচবে। কার্তিক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। বুঢ়াবাপা ওকে শেষদিনে অনেকগুলো টাকা দিয়েছেন আশীর্বাদ করে। সবটাই ও সুচাঁদকে দিয়ে দেবে আবার ব্যবসা শুরু করার জন্য। সুচাঁদকে ও ফিরিয়ে আনবেই। চোয়াল শক্ত করে কার্তিক দৌড় শুরু করল পনসগুড়া খাদানের দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া লাল মোরামের রাস্তা ধরে।

প্রগ্রতিশীল প্রযুক্তি বনাম পারিবারিক সম্পর্ক

হুসনে জাহান

ছোটবেলায় এক মা ও ছেলের গল্প শুনেছিলাম, যেখানে হিংসুটে স্ত্রীর কাছে ভালবাসার প্রমাণ দেবার জন্য ছেলে মায়ের যকৃৎ কেটে থালায় নিয়ে হেঁটে যাবার সময় চৌকাঠে পা লেগে থালাসহ পড়ে যায়। তখন থালা থেকে মায়ের যকৃৎ কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "খোকা, তুই ব্যথা পেলি?"

এ গল্প সম্ভবত আমাদের 'সুয়োরানী দুয়োরানী', 'রেড রাইডিং হুড' আর 'স্নো হোয়াইট' ইত্যাদির মতোই নিছক এক কাল্পনিক রচনা। কোনো মানুষ কেবল হিংসার প্রকোপে বিনা কারণে এত নির্দয় ও নিষ্ঠুর হতে পারে তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়; মেনে নেওয়া তো দূরের কথা। হ্যাঁ, শাশুড়ি ও বউয়ের মাঝে দাবি, অধিকার ও সম্পর্ক বিশেষে কিছুটা মনোমালিন্য ও রেষারেষি বোধ থাকা সম্ভব। সন্তানের জন্ম দিয়ে, তারপর তাকে বড় করে, তার সম্পূর্ণ ভার বৌয়ের হাতে সঁপে দিয়ে মতান্তর ভেদে মনোমালিন্য হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেটা যথাযথ শিক্ষা, সমাজ ও সংসারের মঙ্গলের স্বার্থে প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা আয়ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাও সম্ভব।

তবে ঠিক এই ধরনের চরম পরিস্থিতি না দেখা গেলেও কোনো কোনো মা ও পুত্রবধূর সম্পর্কের গরমিলের কাহিনী শোনা যায়। মানব চরিত্রের এই চিরন্তন অধিকার প্রবণতা ও হিংসাত্মক মনোভাব তার সৃষ্টির গোড়া থেকেই কোনো না কোনোভাবে কোথাও না কোথাও প্রকাশ পেয়েছেই। মানুষের এই কলুষতা, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিকতার মাপকাঠি দিয়েও সবসময় পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয় না। রূপকথার সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্প পড়লেই তো এ কথার সত্যতা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। তবে সম্ভবত আজকের সুয়োরানী দুয়োরানীর সেই হিংসাত্মক মনোভাব ও কার্যকলাপ ভদ্রতার মাপকাঠি মেনে কেউ কেউ দমন করে চলতে শিখেছে। কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি কি বৃদ্ধ বাবা মা'র পরিস্থিতির কিছুটা সুরাহা করতে পেরেছে?

আমার নাতি যখন ৭/৮ বছরের, (এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে) তার সাথে লাইব্রেরিতে গিয়ে নানান দেশের নানান ধরনের রীতিনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার কাহিনী পড়তাম। এক দেশের বিবরণে পড়েছিলাম যে সে দেশে

বয়োজ্যেষ্ঠ যখন পরিবারের বা সমাজের কাছে অকেজো ও বোঝা হয়ে পড়ে, তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে বাসার চালে উঠিয়ে চালকুমড়ো বানিয়ে দেয় নিচে গড়িয়ে পড়ে যাবার জন্য। পড়ে মনে হয়েছিল কী নিষ্ঠুর ওই দেশের মানুষগুলো ও তাদের সামাজিক মনোবৃত্তি। যে মানুষ নিজের জীবনের শেষ রক্তকণিকা নিঃশেষ করে সন্তানকে জন্ম দিয়েছে, ভরণ পোষণ ও লালনপালন করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে যখন পরিবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তখন পরিবার তার এমন দুর্দশা করে!

আমাদের পূর্বপুরুষের আমলে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক আমরণ সকল সুবিধা অসুবিধা মেনে অবিচ্ছিন্ন এক পারিবারিক নিয়মে চলেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতির ধাপে ধাপে সব সম্পর্কের মাঝেই জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ক্রমশঃ স্থান করে নিয়েছে। জীবনের শেষ বেলায় আমার আশেপাশে এ ধরনের কিছু বাস্তব ঘটনা লক্ষ্য করে আমার চিন্তা শেয়ার করছি।

১ নং রূপরেখা

প্রথম দৃশ্য

- "তুমি কী চাও, বাবা?" বিছানায় শোয়া বাবার দিকে ঝুঁকে দু'সপ্তাহের জন্য বাবাকে দেখতে আসা মেয়ে জিজ্ঞাসা করে। কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পর ফ্যাল ফ্যাল করে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করে, "তোমাকে, মা।" বাবার হাতে হাত বুলিয়ে মেয়ে জবাব দেয়, "তা কি করে সম্ভব, বাবা?" আমাকে তুমি বিদেশে শিক্ষা দিয়ে বিদেশে চাকুরিরত ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছ। এখন আমার স্বামী, সংসার ফেলে আমি কেমন করে তোমার কাছে থাকব?"

দুদিন পর মেয়ে ফিরে গেল যুক্তরাষ্ট্রে নিজের সংসার ও পরিবারে। আর বাবা আই সি ইউ, কেবিন, অক্সিজেন পাইপ, খাবার টিউব, ক্যাথেটার লাগিয়ে দুজন প্যারামেডিকের করুণায় শায়িত। তাদের একজন বিকেলে ভিজিটিং সময়ানুযায়ী খোঁজ নিতে আসে। অন্যজন বাসায় খবরাখবর করার দায়িত্বে বহাল। দুটো স্নেহের কথা বলার বা মায়াভরে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আজীবন জ্ঞানীগুণী স্বনামধন্য বুড়ো মানুষটার ভাল উপার্জনের কারণে বড় হাসপাতালের আই সি ইউতে থাকবার সামর্থ্য হয়েছে, নাহলে নিজ বাসস্থানে নিজ ব্যবস্থায় কোনো কাজের লোকের কৃপাপ্রার্থী হয়েই মর্ত্যের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে যেতে হতো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

- "আপনার কি নিজের লোক কেউ নেই যে আপনাকে দেখতে আসতে পারে?" বৃদ্ধনিবাসসংলগ্ন হাসপাতালে শায়িত অসুস্থ মহিলাকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

- "হ্যাঁ, আসবে, সবাই আসবে বলেছে। আমার ছেলে শিগগিরিই আসবে।" জড়িয়ে জড়িয়ে মলিন হাসিতে মহিলা জবাব দেয়। কেউ আসা তো দূরের কথা, দৈনিক পত্রিকার এক খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে এক মায়ের তিন সন্তান সবাই যে যার মতো দেশে বিদেশে ভাল চাকুরিরত থাকা সত্ত্বেও সরকারী হাসপাতালের বিছানায় চিকিৎসারত মায়ের খোঁজখবর নেওয়া বা খরচপত্র মেটাবার জন্য ছ'মাস অবধি কাউকে দেখা যায়নি।

তৃতীয় দৃশ্য

নীনা রোজ অফিসের কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে বিছানায় শায়িত মায়ের সাথে দেখা করতে আসে। একদিন বিকেলে সামনের দরজায় ঘন্টা না বাজিয়ে পেছনের দরজা খোলা পেয়ে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে বাসায় প্রবেশ করে। তড়িৎ গতিতে ড্রাইভারের আলিঙ্গন থেকে এক কাজের মেয়ে ছিটকে সরে দাঁড়ায়। আরো দুজন কাজের মেয়ে রান্নাঘরে চুলোর পাশে বিশ্রামরত। এসব দেখে নীনা কিছু না বলে পারল না, "তোমরা তিনজনই এখানে। আর মা একা উপরে? দুজন নেমে এলেও মায়ের কাছে অন্তত একজন তো থাকা দরকার। সবাই নিচে থাকলে মায়ের কিছু হলে কে সামলাবে?" বলে নীনা দোতলায় মায়ের কাছে উঠে গেল। পেছনে ড্রাইভারের প্রেমাসিক্ত মেয়ের চিৎকার শোনা গেল, "আমাদের পিছনে এরকম লাগলে এখানে কাজ করা সম্ভব হবে না।" মা শুনতে পেয়ে নীনাকে ক্ষীণস্বরে তিরস্কার করে বললেন, "মাগো, তুমি ওদের কিছু বলো না; ওরা রাগ করে চলে গেলে তখন কী করব?"

নীনা অনেকদিন মা'র কাছে বসে থেকে মাকে পুনরাবৃত্তি করতে শুনেছে, "আমার মা'র সাথে কত না রাগ করেছি। কোনো সময় আমাকে কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখলেই মা জিজ্ঞেস করতেন, 'কি মামণি, মাথা ধরেছে? নাকি শরীরটা খারাপ লাগছে মা?' নয়তো 'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, মামণি?' শুনে সাথে সাথে মুখ ঝামটা দিয়ে জবাব দিয়েছি, 'আঃ, কী

যন্ত্রণা, তোমার জন্য একটু শুয়ে বিশ্রাম করাও যায় না।' এখন প্রায়ই মনে হয় সেরকম আদর করে কেউ আর কখনো বলবে না।"

চতুর্থ দৃশ্য

- "আন্টি জানেন, আমি স্বামী, সন্তানসহ দেশ থেকে চলে এসেছি। প্রথমে আমাদের মোটে কোনো টাকা পয়সা ছিল না। চারটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক কষ্ট করে এদেশে ছোটখাটো রান্নার কাজ করে, স্বামী ট্যাক্সি চালিয়ে, পড়াশোনা করেছি। তারপর পাস করে, ভাল চাকরি করে ছেলেমেয়েদের সবাইকে পড়ালেখা করাতে পেরেছি। এখন আমাদের যথেষ্ট রোজগার – বাড়ি, দুটো গাড়ি সবই আছে, কিন্তু সেদিন আমাদের বাবা মা অসুস্থ হবার ও পৃথিবী থেকে চলে যাবার খবর পেয়েও টাকার অভাবে দেখতে যেতে পারিনি। সে কষ্ট কোনদিন ভুলতে পারব না। তাই এখন প্রতি বছর দেশে তাদের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানাতে যাই।"

পঞ্চম দৃশ্য

- "আন্টি, আমার মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত, আমি ঢাকা এয়ারপোর্টে প্লেনের অপেক্ষায় বসে আছি। দুঃখে মনটা ভেঙে যাচ্ছে। অসুস্থ শয্যাশায়ী মাকে এক কাজের মেয়ের তদারকিতে রেখে চলে যাচ্ছি। মা'র সাথে আর দেখা হবে কিনা জানি না।"
সে বিদেশে ফিরে আসার এক মাস পরই মায়ের বিয়োগান্তের খবর আসে।

***

২ নং বিপরীত রূপরেখা

আজকাল কিছু ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে কোনো কোনো উচ্চশিক্ষিত বিদুষী মায়েরা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে সন্তান ও পিতামাতার মাঝে এক স্থায়ী বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলে। নিচে তারই কয়েকটি উদাহরণের সাথে হয়তো আমরা কেউ কেউ পরিচিত।

প্রথম দৃশ্য

পাঁচ বছরের এক ছেলে মায়ের সাথে বিছানায় শুয়ে বলছে, "মা, আমার যেন সব সময় জ্বর ও অসুখ থাকে।"

- "ছিঃ বাবা, এরকম কেন বলছ? তুমি শিগগিরিই ভাল হয়ে যাবে, তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।"

- "আমার অসুখ যেন ভাল না হয়, মা।"

মা তাড়াতড়ি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, "ছিঃ, ও কি কথা? কেন ওরকম বলছ?"

- "জ্বর হলে যে আমি তোমার কাছে শুতে পারি।"

এ কথোপকথন কোনো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়নি। ছেলের বাবা বিদেশে ট্রেনিং-এ গেছে, মা এক সপ্তাহ পরে সেখানেই পড়তে যাবে, তাই ছেলেকে আলাদা বিছানায় শোবার অভ্যাস করাচ্ছিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রেশমা ও তার স্বামী অনেক মোটা বেতনে বিদেশে ডাক্তারির চাকরি পেয়ে ছোট মেয়েকে সাথে নিয়ে মাধ্যমিক স্কুলে পড়া বড় ছেলেকে তার মা ও বাবার কাছে রেখে চলে যায়। প্রতি বছর ছুটিতে এক মাসের জন্য দেশে আসে। দেশে মায়ের কাছে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে ছেলে কথা শোনে না, কিছু বখাটে ছেলের দলে ঘোরাফেরা করে, রাতে দেরি করে ফেরে, স্কুলের পরীক্ষায় পাস করে না ইত্যাদি। দেশে এসে এসব শুনে বাবা বকাবকি ও রাগারাগি করে, মা নানাভাবে বোঝায়, কিন্তু আবার তারা চাকুরিস্থানে ফিরে যায়। দশ বছর বিদেশে চাকুরির পর যথেষ্ট টাকাপয়সা উপার্জন করে যখন তারা দেশে ফিরে আসে, তখন তাদের ছেলে নেশাখোর হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে চিকিৎসাধীন।

তৃতীয় দৃশ্য

গুণী বাবা প্রথমে গেলেন বিদেশে উন্নত ট্রেনিং নিতে। গুণী প্রফেসর মা ছিলেন তখন অন্তঃসত্ত্বা। বিদেশে পড়বার স্কলারশিপ পেয়েও স্বামীর সাথে বিদেশ যাওয়া হ'ল না। কন্যা সন্তানের জন্মের চল্লিশ দিন পর্যন্ত দেশে থেকে যেতে হ'ল। তারপর শাশুড়ির কাছে শিশুকে রেখে উচ্চশিক্ষার জন্য সেও বিদেশে স্বামীর কাছে চলে গেল। স্বামীর ট্রেনিং শেষ হলে সে দেশে ফিরে এল। কিন্তু ডক্টরেট ডিগ্রি হাসিল করার জন্য স্ত্রীর চার বছরের আগে দেশে ফেরা সম্ভব হবে না। চার বছর পর মা ফিরে এলে ঠাকুমার আদুরে চার বছরের মেয়ে তার গর্ভদাত্রীকে মা বলে মেনে নিতে একেবারেই রাজি হ'ল না। ঠাকুমার দেহত্যাগের পর বাবা-মা'র কাছে সে থাকল ঠিকই, কিন্তু মায়ের সাথে মানসিক দূরত্ব কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বাবার পাশেই সে শুয়ে থাকত, আর ভালমন্দ কোনো বিষয়েই সে মায়ের সাথে আলোচনা করত না। বিয়ের বয়স হলে মায়ের

পছন্দের ছেলেদের কারো সাথেই সে দেখাশোনা করতে রাজি হ'ল না। বাবা মা'র অজান্তে নিজের পছন্দে এক ডাক্তারি পড়া ছাত্রকে সে মনোনীত করল। বাবা মা'র পুরো সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও তার পছন্দেই বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য তারা দুজনেই বিদেশে চলে গেল।

***

৩ নং রূপরেখা

এই রূপরেখার সাথে আমরা সবাই এত পরিচিত যে এর উদাহরণ খুঁজতে বা বুঝতে কারোরই দেরি হবে না। এটাই তো হ'ল পৃথিবীর চলমান সৃষ্টির মূল কথা, যা না থাকলে পৃথিবী অচল হয়ে যাবে।

আমাদের অনেকেরই হয়তো ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক দৃষ্টান্তের কথা জানা আছে, যার কথা চিন্তা করলেই আমার বক্তব্যের সারাংশ বুঝতে অসুবিধা হবে না। ইতিহাস বইতে পড়েছিলাম ভারতবর্ষের বিশাল প্রতিপত্তিশালী মোঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন যখন মরণাপন্ন, তখন তার পিতা নাকি তার বিছানার পাশে বসে দু'হাত তুলে বিধাতার কাছে নিজের জীবনের পরিবর্তে সন্তানের জীবন ভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। এটা কোনো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার নয়। এটাই মাতা-পিতার সাথে সন্তানের প্রকৃত সম্পর্ক।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত আমাদের নিজেদের জীবনে ও আশেপাশে তাকালেই পাওয়া যাবে। সন্তান শুধু অসুস্থ হলেই নয়, তার শরীরে একটু দুর্বলতা দেখা দিলেও বাবা মা দুশ্চিন্তায় শেষ হয়ে যায়। সন্তানের সব অসুবিধা দূর করার জন্য বাবা মা সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে। ভাল ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য, হাসপাতাল খুঁজে বার করতে টাকা পয়সা ধন দৌলত, খাওয়া দাওয়া তুচ্ছ করে, সন্তানের অসুবিধা ও অসুস্থতা দূর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সন্তানের উন্নতি ও মঙ্গলের লক্ষ্যে রোদ, ঝড় বৃষ্টি, নিজেদের অসুবিধা, শারীরিক, আর্থিক অসমর্থতা সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। এই নিয়মেই চলে পৃথিবীর জীব জগৎ। পৃথিবীর চলমান অবস্থার প্রধান কারণই এই নিম্নগামী জৈবিক ভালবাসা। এ ভালবাসা শুধু মানুষের মাঝেই দেখা যায়, তা নয়। এর প্রমাণ আমরা গৃহপালিত হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, পাখিদের জীবন লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। পশুপাখির জন্মের পর জন্মদাত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে প্রাণীগুলোকে নিয়মিত খাবার ও পানীয় জুগিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য। শিশুরা একবার স্বাবলম্বী হবার পর মানুষ ব্যতীত অন্য জন্মদাতার ভূমিকা বা দায়িত্ব মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। সেখানেই মানুষের সাথে অন্য জীবের পার্থক্য। স্নেহ-ভালবাসা প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, আশা-নিরাশা সবই মানুষের সাথে আজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

উন্নত প্রযুক্তির যুগে মনে হয় পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে কর্তব্যবোধ আর মমতা প্রকাশের কিছুটা ঘাটতি দেখা যায়। পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম মানুষের জীবনযাত্রার জন্য পিতা মাতা ও সন্তানের ভালবাসা প্রাকৃতিক নিয়মেই নিম্নগামী। তার কারণ পিতা মাতা সন্তানকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করার জন্য ষোলোআনা দায়ী। কাজেই তার ভরণ-পোষণ, লালন-পালন, প্রতিষ্ঠিত হবার পুরো দায়িত্ব বর্তে যায় জন্মদাতাদের উপর। কিন্তু সন্তানের সে ধরনের কোনো দায়িত্ববোধ বা মনোভাব প্রকৃতির নিয়মে প্রয়োজন হয় না। বাবা মা'র প্রতি মায়া, মমতা, দায়িত্ববোধ সবই নির্ভর করে সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব, চাহিদা ও পারিপার্শ্বিকতার উপর।

এক ১১/১২ বছরের অসন্তুষ্ট ছেলের ডায়েরিতে লেখা দেখেছিলাম "জানি না, কীজন্য আমার পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে?" বেশ কয়েক বছর আগে স্তম্ভিত হয়ে খবরে পড়েছিলাম এক পরিবারের দুটি বয়স্ক ছেলে তাদের পিতা-মাতাকে গুলিবিদ্ধ করে জীবনের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিল। হয়তো পারিবারিক শাসন অথবা নিয়মানুবর্তিতায় ছেলেরা অতিষ্ঠ হয়ে কিংবা তাদের অতিরিক্ত দাবি দাওয়া অপূর্ণ থাকার কারণেই এই আচরণ।

সন্তানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব জন্মদাতা বাবা মায়েরই, তা সে যতই কঠিন হোক না কেন। তার প্রতিদানে সন্তানের ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ব বোধ থাকুক বা না থাকুক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মা নিজ দায়িত্বে অচল থাকে। বলা বাহুল্য, সন্তানের ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা পিতামাতার কাছে বিরাট শক্তি হয়ে ওঠে।

উপসংহার

আমরা সকলেই উপরোক্ত রূপরেখাগুলোর সাথে পরিচিত এবং কোনো না কোনভাবে প্রভাবান্বিত। এর সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে কিনা তা বলা কঠিন।

আধুনিক বিজ্ঞানের দ্রুতগতি উন্নতির কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাঝে দূরত্ব ক্রমাগত কমে এসেছে। সেই সাথে বুদ্ধিমান মানুষের চলাফেরার গতিও অবিরত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আজকের মাতাপিতা ও সন্তানের পারিবারিক স্নেহ প্রীতির পুরনো রীতিনীতি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এই উপলব্ধিতে আজকাল বহু দেশেই পরোপকারী জনহিতৈষীরা অথবা সাহায্যকারী সরকার নানা ধরনের নার্সিং হোম, বৃদ্ধাশ্রম চালু করে তাদের দুর্দশা কিঞ্চিৎ লাঘব করার প্রয়াস করছে। সেগুলোর উপযোগিতা ও মান সম্পর্কে প্রশ্ন করার চাইতে মোক্ষম কথা হ'ল – সেগুলো বয়স্কদের অসহায় অবস্থার কিছুটা সমাধান করছে।

ঢাকা, বাংলাদেশের কিছু বিত্তশালী পরোপকারী মানুষ বর্তমান মানবিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চলে বৃদ্ধাশ্রম তৈরী করেছেন অসহায় বয়স্ক মানুষদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য।

এক বৃদ্ধাশ্রমে আমার পরিচিত এক পরিচালিকা সেই বৃদ্ধাশ্রম চালাবার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, "জানেন, এখানকার কোনও কোনও বাসিন্দা তাঁদের বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা সবকিছু থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধাবস্থায় অসুস্থ ও অসহায় হয়ে একা একা কষ্ট পাচ্ছেন খবর পেয়ে আমরা গিয়ে তাঁদের নিয়ে এসেছি। ঐ যে দেখছেন হুইল-চেয়ারে বসা মহিলা – ওঁকে চিনতে পারছেন? আমাদের স্বাধীনতার পর বাংলা সিনেমার এক নামকরা নায়িকা। এখন তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত।

আরেকটি বৃদ্ধাশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম, আমার কলকাতার স্কুলের অ্যালামনাই গ্রুপের সাথে। চারটে বড় বড় ডর্মরুমের দুটোতে পঞ্চাশ জন বৃদ্ধ, আর বাকি দুটোতে ৫০ জন বৃদ্ধাদের জন্য খাট-বিছানার ব্যবস্থা করা। এক শিল্পপতি তাঁর নিজ এলাকায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের অসহায় অবস্থায় দেখে এই ব্যবস্থা করেন। দু'জন নার্স ও একজন ভিসিটিং ডাক্তারেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থান করার শর্ত হ'ল যে এখানে কেউ কোনও ধন-সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা নিজের কাছে রাখতে পারবে না। আর ধর্মীয় অথবা পারিবারিক অনুষ্ঠান পর্ব ছাড়া কেউ বৃদ্ধাশ্রমের বাইরে অহেতুক ঘন ঘন যাতায়াত করবে না। সবার জন্য একই মানের খাওয়া-পরা ও জীবনযাত্রার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আজীবন সরবরাহ করা হবে। তাদের মৃত্যুর পর আত্মীয়পরিজন যদি খোঁজ না করে তাহলে এই বৃদ্ধাশ্রমের গাছপালা পরিবেষ্টিত বিশাল পরিধির মাঝেই তাদের শেষকৃত্য সমাধা হবে।

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে কর্মরত বহু পরিবারই বাবা মা'র জন্য বিদেশের সবুজ কার্ড করিয়ে প্রতি বছর মা ও বাবাকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসার সুযোগ করে নিয়েছে। তাঁরা এলে সন্তানদের সংসারেও কাজকর্মের সুবিধা হয়।

আজকের উন্নত সমাজে বাস্তবতার নিয়ম মেনে নেওয়া ছাড়া আর কী করার আছে? বিদেশের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানের স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে তারা আর বাবা-মা'র সংসারে বাস করে না। আর বাবা মা? আমি কিছু বয়স্ক মহিলার সাথে কথোপকথনে বুঝেছি যে তারাও নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে ইচ্ছুক। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনির সাথে সম্পর্ক ভাল থাকলে তারা আসা যাওয়া করবে, খোঁজখবর নেবে, প্রয়োজনমতো সাহায্য করবে, পারিবারিক অনুষ্ঠানে অথবা ছুটির দিনে দেখাশোনা, বেড়ানো, ঘোরাঘুরিও একসাথে করবে, কিন্তু একসাথে বসবাস দুপক্ষের কারুর কাছেই কাম্য নয়। বয়স্কদের কমিউনিটি সেন্টারের বাসিন্দারা বেশিরভাগই এরকমই মনোবৃত্তির অধিকারী।

অনুন্নত দেশগুলো থেকে উন্নত দেশে মেধা পাচার হয়, ফলে সেসব দেশে এখন পরোপকারী মানুষ ও সরকারের সাহায্যে কিছু বৃদ্ধাশ্রম খোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের যদিও এখনও সেগুলোর ওপর পুরো আস্থা হয়নি। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমে যাবার কথা অনেকেই এখনো ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু এছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে? এক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্তত কাউকে পাশে পাওয়া যাবে। এই ধরনের মনোভাব এবং সমাজ ব্যবস্থা এখন বহুল প্রচলিত।

নিজেকে জানা একটি জরুরি ভাবনা

মৃণাল চৌধুরী

আত্মোপলব্ধি দিয়েই শুরু করি | 'আশিতে আসিও না' সতর্কবাণীর মুখে ছাই দিয়ে জীবনের আট দশক পেরিয়ে এসে কিছুদিন ধরে একটা বিশেষ ভাবনা আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে; নিজেকে জানা | বিষয়টি নিয়ে আমার আগে বহু মহাজ্ঞানী, মহাজন থেকে শুরু করে অবিখ্যাত বহু চিন্তক ভেবেছেন | তাঁদের ভাবনা নিজেদের মতো করে লিখেও গেছেন, যার কিছু কিছু আমরা পড়েছি | কেউ কেউ পড়েছি নিষ্ঠার সঙ্গে, নিজেদের জীবন যাপন, অর্জিত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সমাজ ও ইতিহাস চেতনার নিক্তিতে যাচাই করে; কিন্তু অধিকাংশই বেছে নিয়েছেন উদাসীনতা | সংখ্যাগুরুর এই নির্বিকার মনোভাব বিশ্বজুড়ে মানব সভ্যতায় সংকটের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে|

আত্মোন্নতি নামক ভাবনার বীজ সভ্যতার শৈশবেই অমৃতের সন্তানরা পুঁতে দিয়েছিলেন | নিজের পার্থিব সুখ ও সম্পদ আহরণের জন্য প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে ওঠা আত্মকেন্দ্রিকতা প্রথমদিকে নজরে না পড়লেও পরে আধিপত্যকামী বাণিজ্য বিস্তারের যুগে প্রকট হয়ে ওঠে| এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান উত্তর-আধুনিক ডিজিট্যাল অভ্যুত্থানের মধ্যদুপুরে এসে মানুষ যে নিজের স্বার্থসর্বস্ব সুখচিন্তাকে পাগলামির স্তরে তুলে ভবিষ্যৎকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই | এই বিপন্ন সভ্যতা জানান দিচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মহা বিপর্যয় | প্রতিবাদের স্বর চড়িয়ে আন্দোলন হচ্ছে, যেমন বহুবার হয়েছে অতীতে | রাষ্ট্র হয়তো বাধ্য হয়ে কিছু ব্যবস্থা নেবে, যা আগেও নিয়েছে, কিন্তু সংকট তাতে মিটবে কি? উত্তরে হলফ করে বলা যায়, মিটবে না | না, এই কারণে নয় যে আশি পার করা ব্যক্তি, আমি সিনিক্যাল হতাশাবোধে আক্রান্ত | এই কারণে যে মানুষ এই সঙ্কটের প্রকৃত উৎস সন্ধানে ঘোরতর অনাগ্রহী, নির্বিকার | ফলে জন্ম নিয়েছে এমনতর অসুখ, যা সবরকম মহামারীর সম্মিলিত ধাক্কার চেয়েও ভয়ঙ্কর!

প্রায় ছয় দশক আগে যখন আমি জন্মভূমির মাটি, জল আকাশসহ যাবতীয় মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী মায়া ডিঙ্গিয়ে ইতালীয় অভিযাত্রী 'আমেরিগো ভেসপুসি' নামাঙ্কিত মহাদেশে থিতু হই, তখন এদেশের নয়নাভিরাম সমৃদ্ধি আমাকে আরও অনেকের মতো অবশ্যই ব্যক্তিগত সফলতার দিকে প্রণোদিত করেছিল | মুক্ত বাজার অর্থনীতির কুলগুরু আমেরিকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবিরল বিপ্লব ঘটিয়ে শুধু নিজেরা ঝাঁ ঝকঝকে দেশ বানিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, তাদের পসরা নিয়ে ওদের অনুগামী বহু দেশের বাজারে জাঁকিয়ে বসেছে | কিন্তু চোখ ধাঁধানো আলোর নীচেই যে নিকষ অন্ধকার জমাট বেঁধে চলেছে, সেটা প্রথম প্রথম টের পাইনি | শুরু করি পেশার প্রয়োজনে আমেরিকার নিজস্ব ভূগোল ছাড়িয়ে প্রায় সবকটি মহাদেশের উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত নানা দেশে গতায়ত, সেই সুবাদে চিনতে ও জানতে পারি বহু অমৃতস্য পুত্রদের | কাছ থকে দেখি তাদের কীর্তি, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে সেখানের মানুষদের দক্ষতা ও দুর্বলতা |

বহুল ব্যস্ততার মাঝে তখনই কোন এক সময়ে প্রশ্ন জাগে, আমি কি সবাইকে সঠিকভাবে চিনতে বা জানতে পারছি!

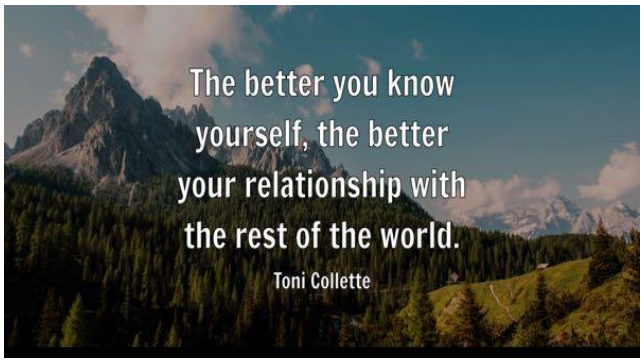

দ্বিধা ও দোলাচলের ঘূর্ণিতে ভেসে ওঠে ছেলেবেলায় স্কুলে সংস্কৃতের মাস্টারমশায়ের পড়ানো 'আত্মানাং বিদ্ধি'র পাঠ | বুঝতে পারলাম অন্যদের সঠিকভাবে জানতে হলে নিজেকে জানা জরুরি | জানা জরুরি আমার মূল্যবোধ, সততার ব্যাপ্তি, চেতনার তল, সার-শিক্ষা লালিত বুদ্ধির সীমা, দক্ষতার মাপজোপ | এক কথায় আমার আমিকে সঠিকভাবে চেনা | যাযাবরের অমর ক্লাসিক 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে

আবেগ' উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। জৈবিক চাহিদার তাগিদে ক্রমাগত ছুটে চলা পেশাদার এবং সাধারণ মানুষদের দেখি সাফল্যের কাঙালিপনা নিয়ে আরও সফল মানুষদের অনুকরণ করতে। রোল মডেলদের কপি-পেস্ট করলেই যেন সাফল্য ক্যুরিয়ারের ঠোঙায় ভরে তাদের দরজায় ডেলিভারি হবে। 'চিন্তা করি, তাই আমি বাঁচি' মন্ত্র নিয়ে যাঁরা চলেন তাঁদের কাছে এমন চিত্রপটই মনকে আলোড়িত করে। আমাকেও করল। প্রতিযোগিতার উদ্ভট দৌড়ের মাঠে নিজেকে মনে হ'ল ঠাঁইনাড়া; কেন আমি ওদের মতো হতে পারছি না বা হতে চাইছি না। আরও খোলাখুলি বলা যায়, ওদের শিরোধার্য করে সফলতর কাউকে অনুসরণের নেশা আমার মনে কোনও আকর্ষণ জাগাচ্ছে না। সে বড় সুখের সময় ছিল না।

অচিরেই মাথায় গুনগুনিয়ে উঠল লালন সাঁই – "একবার আপনাকে চিনতে পারলে যাবে অচেনারে চেনা"। আমাকেও বলতে হবে, "আমি চিনেছি নিজেকে সহসা / আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।"

নানা কাজের মধ্যেই নিজের জন্য সময় বার করে আরম্ভ করলাম পড়াশোনা ও অনুশীলন। কাজটা কঠিন, যথেষ্ট

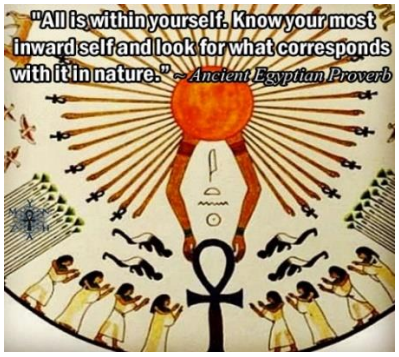

আয়াসসাধ্য কিন্তু একই সঙ্গে আনন্দদায়ক। সনিষ্ঠ অনুশীলন বুঝিয়ে দিল নিজেকে আমরা যতটা দেখি তা প্রায় না দেখার মতো, জলে ভাসা পদ্মের মতো। যা কম বেশী আত্মমুগ্ধতা তৈরী করার অবচেতন প্রয়াস মাত্র। নিজেকে চেনা ব্যাপারটা ঠিক কী রকম বোঝানোর জন্য বিজ্ঞানের একটি উপমা দেওয়া যাক। আইসবার্গ থিওরির ব্যাখ্যা। একটি ভাসমান বরফ খন্ডের পুরো আয়তনের শতকরা পাঁচভাগ থাকে জলের ওপর, বাকি পঁচানব্বই শতাংশ জলের নীচে। ঠিক তেমনই আমাদের সত্তার বৃহৎ অংশটি নিজেদের কাছে দৃশ্যমান নয়, অন্তরের অন্তঃসলিলে নিমজ্জিত। সেই অতলে শিকড় বিছিয়ে আছে আমাদের স্বপ্ন, অকৃত্রিম আবেগ, আত্মিক শক্তি ও দুর্বলতার নানা উপাদান, দক্ষতার বীজ – এক কথায় ব্যক্তি 'আমি'-র SWOT বিশ্লেষণের এককগুলো। সুতরাং নিজের ভিতরে ডুব সাঁতার দিতে পারলে নিজের গভীরতার মাপজোপ করে ফেলা যায়। কাটিয়ে ফেলা যায় নিজের ভয়, দুঃসাহসিক মূর্খামির ঝোঁক, অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অকারণ লোভ এবং অতি অবশ্যই দ্বিধা দ্বন্দ্বের জমাট সংস্কার। খুঁজে পাওয়া যায় ভিতরে থাবা গেড়ে বসা দুর্বলতাগুলো এবং সেগুলো কাটিয়ে নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে বদলে ফেলার শক্তি। নিজের মধ্যে জ্বালিয়ে নেওয়া যায় "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে" পথ দেখানোর আলো; "অপ্পোদীপো ভব"।

কোন তত্ত্বকথা বিছানো চাদর থেকে খুঁটে নয়, এ সবই আত্মানুসন্ধানের অনুশীলনে আমার অর্জন। আমি একা নই, আমার মতো আরো কিছু মানুষকেও দেখেছি একইভাবে উন্নীত হতে। আমরা আত্মবিশ্বাসী হয়েছি, অন্তস্থ বহু দুর্বলতা নির্মূল করে কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে গেছি মানুষের প্রতি আস্থা রেখে। এমনকি তথাকথিত প্রতিযোগীদের জন্য থাকা স্বাভাবিক বিরূপতা রূপান্তরিত হয়েছে সহমর্মিতায়। বদলে গেছে তাদের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন। প্রতিযোগীরা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন সহযোগী, সহযাত্রী। আবার পরিচয়ের বৃত্তে ঢুকে পড়া মানুষজনকে যথাযথ বুঝতে যেসব অসুবিধা থেকে যাচ্ছিল, তাতে অস্বস্তি গেড়ে বসছিল; সেসব থেকে মিলেছিল স্বস্তির রেহাই, ষোলআনা না হলেও বারোআনা তো বটেই।

তবে কি কোথাও ভুল করিনি? করেছি।

কোথাও কি ঠকে যাইনি? গিয়েছি।

কিন্তু আত্মমুখী যাত্রায় "ভালমন্দ যাহাই ঘটুক সত্যরে লও সহজে" রবি কবির এই চেতাবনি মর্মে গেঁথে যাওয়ার ফলে ক্ষতি থেকে উদ্ভূত ক্ষোভের মতো মানসিক প্রবৃত্তিগুলোকে সংযত করে এগিয়ে যেতে পেরেছি। আমার কাছে সাফল্য কোন পূর্ব নির্দিষ্ট ঠিকানা হয়ে ওঠেনি, হয়েছিল অনিবার্য ব্যর্থতার ছাই সরিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলার এনার্জি, সম্পর্কের গন্ডিগুলোকে প্রসারিত করার চালিকাশক্তি, এককথায় পোটেন্ট ড্রাইভিং ফোর্স। এহেন উপলব্ধির প্রতিধ্বনি পাই ফ্রেডরিক নিৎজের 'বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল'-এ, "Success has always been the greatest liar, and the work itself is success."

যদিও আহৃত অভিজ্ঞতায় জানতাম দশজনের মধ্যে ন'জন না হোক আটজনের এ বিষয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। আত্ম অহং যা সব সম্পর্কের রসায়নকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলে, তারা তাতেই বুঁদ। আজকের ডিজিট্যাল তথ্য প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় আণবিক বিস্ফোরণের যুগে অনেক সুযোগ সুবিধা তৈরী হওয়ার সমান্তরালে ভয়ঙ্কর তীব্রতায় ছড়াচ্ছে এক মারণ নেশা, বিশেষতঃ মিলেনিয়াল প্রজন্মের মধ্যে। চিরাচরিতভাবে স্বীকৃত পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, সম্পর্কের রসায়ন ভুলে তারা মেতে থাকছে ভার্চুয়াল জগতের মরীচিকা নিয়ে। ক্ষুদ্র স্বার্থতাড়িত মূলত অসংবেদনশীল এই জগৎ হয়ে উঠেছে বেহুলা লখীন্দরের বাসরঘর, বিষধারী কালনাগিনীরা ঢুকে পড়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত তার সাক্ষী হচ্ছি আমরা। সমাজে অবিরত অগভীর সম্পর্কের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাতে নানান নৃশংসতম পরিণতিও রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেসিন লার্নিং, রোবোটিকসের ব্যাপক প্রয়োগে বিষাদের চিত্রনাট্য যে বদলাবে না তা মোটামুটি নিশ্চিত।

মুক্তির ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদরাও আজ ফিরে তাকাচ্ছেন সেই আত্মানুসন্ধানের দিকে। অতএব, নজর দেওয়া যাক আত্মানুসন্ধানের জন্য করণীয় ও পালনীয় পন্থাগুলোতে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ আমাদের বিনা কারণে 'অমৃতস্য পুত্র' বলেনি, বলেছিল সংকট নিরসনে মানুষের অনন্য ধীশক্তির প্রয়োগ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে। নিজেকে জানার জন্য দরকার সেই ধীশক্তির কিয়দংশ ও তার অনুশীলন।

আমরা যে সমাজে জন্ম নিই সেখানে যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরিয়ে বহমান থেকে গেছে কিছু

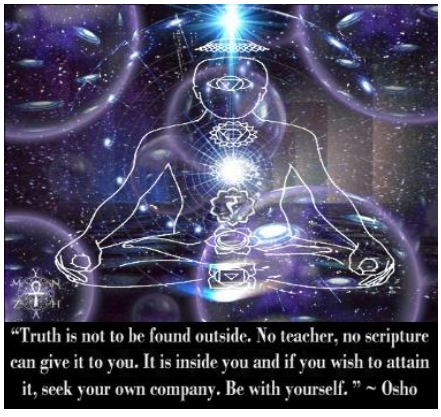

অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধ। প্রতি ধর্মেও আছে তাদের উচ্চকিত উপস্থিতি। নাস্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীনরাও সেগুলি অস্বীকার করেন না। মূল্যবোধগুলির মূল আধার হ'ল ভালবাসা, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতা, যা আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে, ডিএনএ-তে মিশে থাকে। আমরা যদি আমাদের চেতন ও অবচেতনে এই বোধগুলোকে সততার সঙ্গে লালন করি তাতে তৈরী হয় নিজের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, দৃঢ়তর হয় আত্মপ্রত্যয়ের ভিত। মনের সুপ্তিতে থাকা স্বপ্নরা পাখা মেলে আত্মশক্তির আলোর দিকে ছুটে আসে, আমাদের চালিত করে ভিন্নতর বোধের দিকে। জীবনপুরের পথিক হিসাবে বুঝতে পারি পাশাপাশি নানা ভূমিকায় হেঁটে চলা মানুষজন ও পরিবেশ যদি ভাল না থাকে, ভাল থাকব না আমি ও আমরা। সমাজ, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি এই দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় 'আমার আমি'। আশি সংখ্যা পার হওয়া আজকের আমি হলফ করে বলতে পারি বিফলে যাবে না এ পথেই আলো জ্বেলে নিজেকে জানার প্রয়াস। আত্ম আবিষ্কারের সুখ পার্থিব স্বাচ্ছন্দকে ভিন্নতর অর্থে অর্থবহ করে তুলে হয়ে উঠবে মানবিক সংযোগের জীয়নকাঠি। এর বিপরীতে আছে ক্ষুদ্র স্বার্থের চোরাস্রোতে আত্মবিস্মরণের টান, আপাত লাভের অমোঘ লোভ। তার কবলে টাল খায় আত্মবিশ্বাস – ঈর্ষা, রাগ, দ্বেষ, লালসা, কামনা সঙ্গোপনে সিঁদ কেটে সুস্থ চিন্তার উঠোনে চারিয়ে দেয় বিশৃঙ্খলার বীজ। হুঁশ হারায় মানুষের মনুষ্যত্ব। এই স্খলন বিরল নয়, বরং বহুল। চেষ্টা থাকলে যে রাশ টানা যায়, নিজেকে জানার অনুশীলনে বারবার তার প্রমাণ পেয়েছি। বিবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে জাত অশান্তি ও অস্থিরতার মাঝেও অটুট থেকেছে মনন ও বোধ নামক মূল দুই শক্তি। লাভ যতটা হয়েছে নিজের, ততটাই সঙ্গী মানুষদেরও। অতএব, 'মন চলো নিজ নিকেতনে'। খোলা থাকুক দরজা জানালা, আসুক আলো বাতাস। খোলা স্পেসে মাঝে মাঝে আছড়ে পড়বে ঝড়-ঝঞ্ঝা। আত্মবিশ্বাসের দেওয়াল যদি শক্ত করে গড়ে নিতে পারা যায় সেখানে প্রতিহত হবে যাবতীয় ঘাত প্রতিঘাত। যদি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাকে নিটোল রাখা যায়, তাহলে প্রতিদানে মিলবে অভয় জাগানো সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের বাড়ানো হাত। তুমুল প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে নিজেকে যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে তোলার পরীক্ষায় আমাদের প্রতিনিয়ত অজস্র

প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় | আমার পঠিত ও অনুশীলিত অভিজ্ঞতার সূত্রে বলব যাবতীয় জটিলতার উত্তর খুঁজুন নিজের অন্তরে | আর যদি আমার আমিকে খোঁজার প্রক্রিয়া চালু থাকে তাহলে উত্তরগুলোও হেঁয়ালির খোলস ছেড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে | আবার বলি নিজেকে জানার কাজটা কঠিন কিন্তু সাধ্যাতীত নয় |

কিছু অনুশীলন সহজেই করা যায়, যেমন –

১. সারাদিনে কিছুটা সময় নিজের জন্য রাখুন, একা থাকুন | এই একাকীত্বে ষোলআনা সততার সঙ্গে আত্মবিশ্লেষণ করুন | অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে বারবার ফিরে দেখুন নিজের শক্তি ও দুর্বলতার দিকে; দেখুন ভাল ও মন্দ | মনকে শান্ত রাখুন | ইতিবাচক ভাবনায় নিজেকে জারিত করুন |

২. কী হতে চাইছেন – এই ভাবনার চাপ সরিয়ে জোর দিন আপনার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ চেনার ওপর | খুঁজে নিন নিজের স্বাতন্ত্র এবং নিরপেক্ষভাবে বুঝে নিন আপনার বড় স্বপ্নগুলো পূরণ করতে তা উপযোগী কিনা! যদি মনে হয় হ্যাঁ, আত্মবিশ্বাসী হোন; যদি তা যথেষ্ট মনে না হয়, তাহলে লক্ষ্য স্থির করুন |

৩. যাচাই করে নিন নিজের সামর্থ্য, কোন কাজের জন্য আপনি বিশেষভাবে যোগ্য | এই পর্বে আত্মানুসন্ধান সময়সাপেক্ষ, সাধারণত সহজে ফলপ্রসূ হয় না | নিজের সেরাটুকু দিয়ে চেষ্টা করুন, তাতেও যদি ব্যর্থ হন এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন, হাল ছেড়ে পর্যালোচনা করুন আপনার যোগ্যতার অন্যদিকগুলো | নতুন উদ্যমে শুরু করুন | চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন আমরা একই সময়ে আমাদের মাথায় চারটি বিষয়কে রাখতে পারি |

৪. নিজে কী করতে চাইছেন, অর্থাৎ কোন কাজের দিকে আপনার ঝোঁক ও ভালবাসা পরিষ্কার বুঝে নিন | এতে আপনি যাই করবেন তাতে মানসিক সন্তুষ্টি থাকবে | আপনি কী করে খুশি হয়েছেন বা কী করে খুশি হননি তার হিসাব রাখুন, ফলে আপনি নিজের খুশি-অখুশি এবং পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং নিজেকে আরো ভাল করে উপলব্ধি করতে পারবেন |

৫. আত্মসন্দেহ থেকে মুক্ত থাকুন | আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর করুন | ধরুন, হঠাৎ যদি মনে হয় যে জীবন আপনি পার করছেন তা যথেষ্ট ভাল নয়, তাহলে আপনি আপনার ছোট, বড় সব অর্জনগুলোর একটি তালিকা তৈরী করুন সাফল্যের মাত্রা বা পরিমাণ নিয়ে বাছবিচার না করে | দেখবেন সত্যিই কী দারুণ সময় গেছে আপনার | মানুষ আত্মবিশ্বাস নিয়েই সবচেয়ে বেশী সমস্যায় ভোগে, নিজের আত্মবিশ্বাসে শান দিন |

৬. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় স্থির থাকতে নিজেকে তৈরী করুন | আমাদের মস্তিষ্ক অনেক সময় মনে করিয়ে দেয় যে কোন কাজগুলো শুরু করেও আমরা শেষ করিনি | আর এই কারণে প্রায়শই দেখা যায় অসমাপ্ত কাজগুলির চিন্তা আপনার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে | এজন্য কোন কাজে অগ্রাধিকার দেবেন তা লিখে ফেলুন এবং সে অনুযায়ী কাজ করুন |

৭. যে জিনিসগুলো আপনাকে দমিয়ে রেখেছে, যেসব বিষয় আপনাকে এগোতে দিচ্ছে না, সেগুলোর মুখোমুখি হোন | এহেন উদ্যোগ আপাতদৃষ্টিতে সুখকর না হলেও, চ্যালেঞ্জটা নিন | দেখবেন শেষ হাসি আপনিই হাসবেন |

উপসংহারে একটি সতর্কীকরণঃ

নিজের যাপনে সম্পর্ক ও তার সাথে জড়িত স্বার্থের সমীকরণগুলোকে কোনরকম ফর্মুলার লেন্স দিয়ে বিচার করতে গেলে শেষ পর্যন্ত হাতে থেকে যাবে শুধুই পেন্সিল, প্রাপ্তির ভাঁড়ারে জমবে হাহুতাশ | সুতরাং এ বিষয়টি মাথায় রাখা বিশেষ দরকার |

সমাপ্তিতে স্মরণ করে নেওয়া যাক অমিত প্রতিভার এক বিরল মালিক আইনস্টাইনকে, যিনি সক্রেটিস শিষ্য অ্যারিস্টটলকে উদ্ধৃত করে একবার বলেছিলেন, "Knowing yourself is the beginning of all wisdom."

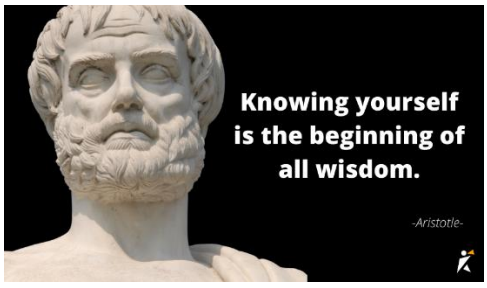

আ মরি বাংলাভাষা

সোমা ঘোষ

১৯৯৮ সাল। দিল্লির গ্রীষ্মের গনগনে দুপুর গড়িয়ে কখন জানি বিকেল হয়ে এসেছে। বাইরে যদিও বেশ রোদ্দুর। চিত্তরঞ্জন পার্কের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি গত দু'মাসে দিল্লিতে পাতা নতুন সংসারের হিসেব নিকেশ নিয়ে একটু অন্যমনস্ক। একতলার গেটের সামনে থেকে কে যেন বলল, "কাল তোমাদের দরজার তলা দিয়ে একটা চিটঠি ডেলে দিয়েছিলাম, পেয়েছিলে?" গলার মালিক আমাদের তিনতলার প্রতিবেশী বসুবাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "চিটঠিটা ডেলেছিলাম, মিলেছে তো?" মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম, কিন্তু মগজের খাঁজে খাঁজে, 'ডেলেছিলাম, চিটঠিটা, মিলেছে' কথাগুলো বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মতো খাবি খেতে লাগল।

বসুবাবুর বাবা দেশভাগের সময়ে বাংলাদেশের কোনও নগর বা গ্রাম থেকে তল্পিতল্পা গুছিয়ে চলে এসেছিলেন রাজধানী দিল্লির এই দক্ষিণ কোণায়, ইস্ট পাকিস্তান ডিস্প্লেসড পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বাস্তু কলোনিতে। সঙ্গে বাংলাভাষাটাও এনেছিলেন বলেই বিশ্বাস ছিল আমার। তাই খাবি খাওয়া মনকে থামিয়ে বোঝালাম যে বসুসাহেব কন্ট্রাক্টর মানুষ, সারাদিন মিস্ত্রি মজুর খাটান; তাই বোধহয় তাঁর ভাষার মাধুর্য ইঁট-কাঠ-পাথরের তলায় চাপা পড়ে গেছে। নাহলে কি কেউ স্বেচ্ছায় নিজের ভাষা ভুলে যায়? কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাজারে, দোকানে, পাড়াতে, নতুন পাওয়া বন্ধুদের মুখে নিত্য নতুন নানা কথা কানে আসতে লাগল। "ইনি আমার বাবা হচ্ছেন", "কবুতরগুলো বহুত শয়তান আছে", "নৌটঙ্কি করিস না তো", "ইলিশ মাছটা আজ খুব টাটকা হচ্ছে" ইত্যাদি, শুনতে শুনতে আমার কিছু ভুল ধারণা ভাঙল, আর কিছু নতুন জ্ঞানপ্রাপ্তিও ঘটল। প্রথম ভুল ধারণা – বাংলা মাতৃভাষা বলেই যে তাকে মায়ের মতো করে আঁকড়ে থাকতে হবে, তা বেশিরভাগ বাঙালির বাইবেলে লেখা নেই। সে স্বদেশেই হোক কি প্রবাসে!

বাঙালিদের 'ঘেটো' চিত্তরঞ্জন পার্ক ফেলে যখন উঠে গেলাম গুরগাঁও-এর এক আকাশচুম্বী বাড়িতে; লিফ্টে দুই প্রতিবেশী বাঙালির কথোপকথনে আড়ি পেতে হ'ল জ্ঞানপ্রাপ্তি। এক ভদ্রলোক, সম্ভবত মধ্য কলকাতার বাসিন্দা, শুধালেন, "আরে ইয়ার, মুখার্জি সাহাব! কাঁহা হো আপ আজকাল?" মুখার্জির জবাব এল "ম্যাঁয় তো ইধার হি হুঁ, আপ কা হি দর্শন নহি মিলতা হ্যায়।" বাংলার বাইরে পদার্পণ করে কতিপয় বাঙালি বাংলা বলতে লজ্জা পায় জেনে সেদিন বোধহয় আশ্চর্যই হয়েছিলাম।

মধ্য প্রাচ্যের মরু শহরে সংসার পাততে গিয়ে আলাপ হ'ল অন্য এক বাঙালির সঙ্গে। তাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ দুর্গাপুজোর আসরে। মনে হয়েছিল, তারা বুঝি মারাত্মকভাবে বাঙালি – ভেদাভেদ ভুলে সব গলাগলি করে রয়, আর কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আওড়ায়। পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, বসন্ত উৎসব, বিজয়া সম্মিলন – কারণে অকারণে রবীন্দ্র নৃত্য, শ্যামাসঙ্গীত, ডি এল রায়ের নাটক, ভূমির জীবনমুখী গানে ছয়লাপ হতো ইন্ডিয়ান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের কমিউনিটি হল। এত পর্যন্ত ঠিকই ছিল। আমিও ভাবতে শুরু করলাম যে, স্বদেশের পরবাসে যে বাঙালি, যে বাংলাভাষার জন্য মন আকুল হতো, এই ঘোরতর বাঙালিদের সান্নিধ্যে বুঝি তা পূরণ হবে।

কিন্তু, হায় রে বাঙালিনীর মন! যে বাঙালির মুখে এত পদ্য, এত গানের ফোয়ারা তাদেরই সঙ্গে সুপার মার্কেটে দেখা হলে 'হাই, হাউ আর ইউ?' ডিনারে দেখা হলে, 'নাইস টু মিট ইউ!' আর কোন পার্টিতে দেখা হলে, 'ক্যান আই হ্যাভ দিস ড্যান্স উইথ ইউ?' সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম বাঙালির ছেলেমেয়েদের দেখে। এদিকে কেমন চোখ গোল গোল করে, মাথা দুলিয়ে, দুলিয়ে "শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে" বলে স্টেজ কাঁপাচ্ছে, অথচ স্টেজ থেকে নেমে মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বাংলার 'ব' পর্যন্ত উচ্চারণ করছে না। জিজ্ঞেস করে মায়েদের থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব উত্তর পেতাম। 'ছেলে মেয়েগুলো এতদিন দেশছাড়া বলে বাংলা ভুলে গেছে রে', 'নাহ রে, বাংলা শিখতেই চায় না আজকালকার বাচ্চারা'; 'ওই তো, জোর করে কবিতাটা ইংরেজিতে লিখে দিলাম বলে তো মুখস্থ করে বলতে রাজি হ'ল', 'বাংলা শিখে কী হবে আর?'

কালে কালে বেশ বুঝলাম, যে বেশিরভাগ বাঙালিই বাংলার চৌহদ্দি পেরোলেই বাংলাভাষাটাকে পুরনো ঘরে ফেলে আসা আসবাবের ঝুলধরা তাকের কোণে তোবড়ানো টিনের বাক্সে বন্দি করে আসে। সঙ্গে আনে 'আমি বাঙালি' নামক

তকমা, যদিও তা হাতির দাঁতের মতো শুধুই বাহারি | আসলে বাংলাভাষা যেন কেবলই ফাঁকা আওয়াজ! তোতার বুলি! মুখস্থ বিদ্যা! একদিন তো একজন বন্ধুকে বলেই বসলাম, "কদ্দিন হ'ল নর্থ ক্যালকাটা ছেড়েছ? এর মধ্যেই বাংলা ভুলে গেলে?"

মাত্র দু'সপ্তাহ আগের ঘটনা | কলকাতায় বসে রেডিও শুনছিলাম | এক আসন্ন বাংলা ছবির গান বেজে উঠল, 'জানেমন, জানেমন...'| চমকে উঠলাম – কলকাতায় কি সংসদের অভিধান ছাপা বন্ধ হয়ে গেছে? নাকি সময় এল অভিধানে নতুন নতুন কথার মানে লেখার? এবার কি ইংরেজির মতো বাংলাও মেলবে মুক্তির ডানা? শক্ত বানান, যুক্তাক্ষর ভুলে সব হবে সোজা, সরল, সাদা? নবাবি আমলে বাংলাভাষার অনেক ভাঙাগড়া হয়েছিল | ঢুকে পড়েছিল 'কুর্শি', 'দরজা', 'পেয়ালা', 'শরবত' ইত্যাদি অনেক আরবি, ফার্সি শব্দ | এবার কি বেনোজলের মতো ঢুকে পড়বে হিন্দি, ইংরেজির, 'জানেমন', 'চিপকলি', 'মজাক', 'নৌটঙ্কি', 'ড্রামাবাজি'-র মতো শব্দ? স্বদেশে, পরদেশে, প্রবাসে বাঙালিদের মুহূর্তে বদলে যাওয়া মতিগতির সঙ্গে, পলে-পলে পালটে ফেলা টিভি চ্যানেলের মতো 'মেড ইজি' করতে কি বাংলাভাষা এবার দোর খুলে দেবে অভিধানের? হবে নাকি নতুন ভাষার, নতুন কথার, নতুন নতুন মানে? ভবে ভোলা বাঙালি কি বাংলাভাষাকে নব কলেবরে ফিরিয়ে আনবে জগৎ সভায়? কোনদিন কি আমার মতো 'তালিবানমনস্ক' যারা, তারা খুঁজে পাব সেই 'সব পেয়েছির' দেশ, যেখানে বাঙালি ইংরেজি হরফে রবীন্দ্রকাব্য না পাঠ করে জন্ম দেবে আরেক নতুন রবির!

সোমা বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই অসাধারণ দক্ষতায় লিখতে পারত | দুই ভাষায় লেখা তার সহজ, সরস, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ হৃদয়-উৎসারিত লেখাগুলি পড়া যাবে নিচের লিঙ্কে |

সোমার ইংরেজি ব্লগ লিঙ্ক:

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/author/somaghosh/

সোমার বাংলা ব্লগ লিঙ্ক:

https://blogs.eisamay.indiatimes.com/author/somaghosh/

করোনা মহামারী অতিক্রান্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রাক মুহূর্তে হিউস্টন দুর্গাবাড়ির আহ্বানে একটি অসাধারণ গীতি আলেখ্যর স্ক্রিপ্ট লিখেছিল সোমা | "ইন্দ্রধনু" নামে সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও লিঙ্কটিও নিচে দেওয়া হ'ল –

https://www.youtube.com/watch?v=jaLvLSRR8dE

খাদির চাদর

রবীন বসু

- **"কী** মজা! কী মজা! আমরা কাল নতুন ফ্ল্যাটে যাব | নতুন ফ্ল্যাটে!" ছোট তাতাই নাচতে নাচতে হাততালি দিয়ে ঘর-বারান্দা করছে |

ওর মা দৌড়ে গেল পিছন পিছন – "ওরে, দাঁড়া | সবে ঘরমোছা হয়েছে, পড়ে যাবি |"

চা-টা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় রজত | আর বসে থাকলে চলবে না | কালই শিফট; বাঁধাছাঁদা শুরু করতে হবে | গতকাল ফাইনাল রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পর ফ্ল্যাটের চাবি পায় সে | থ্রি বিএইচকে রেডি ফ্ল্যাট | প্রি-বুকিং-এর ঝামেলায় যায়নি, ওতে অনেক হ্যাপা | সে সময়ও তার হাতে নেই | এদিকে ভাড়াবাড়ির মালিক বলে দিয়েছেন, এগ্রিমেন্ট আর বাড়াবেন না |

সুদীপাও দৃঢ় অবিচল গলায় বলেছে, "তাতাইয়ের নতুন স্কুল শুরু হবে, আমার এবার ভাড়া নয়, নিজের ফ্ল্যাট চাই |"

অগত্যা সঞ্চয়ের কিছু আর ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে এই ফ্ল্যাটটা কিনেছে রজত | আগে থেকে অর্ডার করা দেয়ালজোড়া বড় সেগুন কাঠের ওয়াড্রোব, দুটো বক্স খাট, ডিভান, ড্রয়িংরুমের জন্য বড় সোফা গতকাল রেখে এসেছে | এখানে যেসব ফার্নিচার আছে – বইপত্র, জামাকাপড়, শীতের পোষাক, ডাইনিং সেট, রান্নাঘরের বাসন, বেশিরভাগটাই আজ বেঁধে ফেলতে হবে | একটু পরেই সেন্টার থেকে লোক আসবে | তারাই সব বাঁধাছাঁদা করবে |

মা স্নান সেরে বেরোতেই রজত বলল, "তোমার ঠাকুরঘরের সব জিনিস গুছিয়ে নিও; কাউকে তো হাত দিতে দেবে না! বিছানাপত্তর কাল সকালে লোক এসে বেঁধে লরিতে তুলবে | তুমি খেয়াল করে সব নিও | পরে আমায় দোষ দেবে না |"

- "না রে বাবা, দোষ দেব কেন! আমি খেয়াল করে সব গুছিয়ে নেব |" সুধারানী ছেলেকে আশ্বস্ত করেন |

রজত এবার কিচেনে গিয়ে স্ত্রী সুদীপাকে বলে, "তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করে ঘরে এসো | আলমারি থেকে জিনিসপত্র সব বের করতে হবে | সেন্টার থেকে ছেলেরা আসবে |"

- "তুমি ঘরে যাও, আমি আসছি |" সুদীপা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে | রজত বেরিয়ে আসে |

বড় একান্নবর্তী পরিবার ছিল তাদের মজিলপুরে। এই মজিলপুর মানে জয়নগর-মজিলপুর। মজে যাওয়া আদিগঙ্গার বুকে গড়ে ওঠা দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক বর্ধিষ্ণু জনপদ। শুধুই মোয়ার জন্য বিখ্যাত নয়। সমাজ সংস্কারক আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর পৈতৃক নিবাস। বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের জন্মস্থান। রজতের বাবা প্রমথনাথ ইরিগেশনে চাকরি করতেন। ঠাকুরদা শ্যামাচরণের হাতে তৈরি চকমেলানো বড় বাড়ি। ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজো হতো। নিজেদের পুকুর-উঠোন-খামারবাড়ি। লাট থেকে ভাগের ধান দিয়ে যেত চাষীরা। সারি সারি গোলা ছিল; সারা বছর অন্নের সংস্থান। পুকুরের চারপাশ ঘিরে বাগান। সবুজ সবজি হতো কত। মধ্যদুপুরে ছিল তাদের অবাধ সাঁতার। কাকারা পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করত, "এবার উঠে আয় সবাই, ভাত খাবি আয়।" শেষে বাবা লাঠি হাতে পাড়ে এসে দাঁড়াতে সবাই সুড়সুড় করে জল থেকে উঠে আসত। মাঝেমধ্যে পিঠে লাঠিও পড়ত। সে শৈশব-কৈশোর ফেলে এসেছে রজত। বড় হয়ে চাকরি জীবনে ভাইয়েরা সবাই ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে। রজত চলে এসেছে এই কলকাতায়। বড়দা চলে গেছে চিত্তরঞ্জনে। শরিকী গণ্ডগোল শুরু হতেই প্রমথনাথ ভাইদের সংসার পৃথক করে দেন। একমাত্র ছোট ছেলে প্রশান্তকে নিয়ে তিনি থেকে গেলেন মজিলপুরে।

তিনি চাকরি থেকে অবসর নিতে রজত বলেছিল, "বাবা, এবার মাকে নিয়ে চলো আমার কলকাতার বাসায়; ওখানে থাকবে। বয়স হচ্ছে, তোমাদের শরীরও আর আগের মতো নেই; আমার দুশ্চিন্তা হয়।"

প্রমথনাথ বলেছিলেন, "না, আমি নিজের পৈতৃক ভিটে জন্মস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তাছাড়া তুমি এখন ভাড়াবাড়িতে থাকো। আগে নিজের বাড়ি করো, তখন না হয় দু'একদিন তোমার মাকে নিয়ে ঘুরে আসব।" তারপর একটু থেমে বলেন, "তোমার ছোটভাই প্রশান্ত একা হয়ে যাবে। ওকে একটা ব্যবসায় দাঁড় করাতে চাই। তোমরা বরং মাঝেমধ্যে এসো। তবে দুর্গাপুজো আর পয়লা বৈশাখ যেন অন্যথা না হয়।"

রজত কথা রেখেছিল। কর্পোরেট অফিসে কাজ সামলে অন্য সময় না হলেও দুর্গাপুজো ও পয়লা বৈশাখে ঠিক বাড়ি যেত। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন প্রমথনাথ। সূর্য প্রণাম সেরেই সবাইকে ডেকে তুলতেন। উঠোন, বাগান, সদর, খিড়কি সব নিজের হাতে ঝাঁট দিতেন। শুকনো পাতা, আবর্জনা সব জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রবি ঠাকুরের গান গাইতেন উদাত্ত কণ্ঠে – 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'। সাথে সাথে ছেলেমেয়েদেরও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গাইতে হতো। পুরনোকে বিদায় দিয়ে নতুনের আহ্বান। পোষ্য গরু, ছাগলদের গায়ে নিমপাতা-হলুদবাটা মাখিয়ে পুকুরে নিয়ে গিয়ে চান করানো হতো। বাড়ির ছেলেমেয়েরাও সবাই সেদিন নিম-হলুদ বাটা মেখে চান করত। পুকুরে জাল ফেলা হতো। বড় বড় রুই, কাতলা, মৌরলা, পুঁটি ধরা হতো। তারপর দুপুরে ভুরিভোজ; বেগুন-নিমপাতা ভাজা, শুক্তো, আমডাল, মৌরলা মাছের ঝাল, পুঁটিমাছ ভাজা, রুই-কাতলার ঝোল, ঘরেপাতা দই, মিষ্টি।

আর দুর্গাপুজোর কটা দিন তো হৈ হৈ করে কেটে যেত। বাড়ির ঠাকুর দালানে সদাশিব কুমোর আর তার ছেলে এসে ঠাকুর গড়ত। কাঠামো গড়া, খড় চাপিয়ে মাটি চাপানো – একমেটে, দোমেটের পর খড়ি করা। শুকিয়ে গেলে রঙ করা। তার্পিন তেল ঘষলে প্রতিমার দেহ চকচক করে উঠত। এরপর চোখ আঁকা, ডাকের সাজ পরানো। সব শেষে পিছনে চালচিত্র লাগানো। ওরা ভাইবোনেরা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখত সব। তারপর আসত বোধন, মহাষষ্ঠী। প্রতিমার আড়াল খুলে দেওয়া হতো। বেজে উঠত শাঁখ। তাদের বুকের মধ্যেও বাজত উৎসবের বাঁশি। সে ছিল এক মায়াজড়ানো কৈশোর স্মৃতি।

বাবা প্রমথনাথের মৃত্যুর পর রজত তার ছোট ভাই প্রশান্তর বিয়ে দেয়। ভাইকে বলে, "মায়ের বয়স হয়েছে, শরীরে নানা সমস্যা। আমার পক্ষে সবসময় এখানে আসাও সম্ভব নয়; মাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই।"

প্রশান্ত মায়ের শরীরের আর নিজের অনিশ্চিত রোজগারের কথা ভেবে রাজি হয়ে যায়। সুধারানী ছোটছেলেকে একটু বেশি ভালবাসতেন, তবুও তিনি কলকাতায় যেতে রাজি হলেন। তবে একটা শর্ত রেখে – বছরে একবার তাঁকে স্বামী-শ্বশুরের ভিটেতে আনতে হবে।

সেন্টার থেকে লোকজন এসে গেল। ওরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত; সব জিনিসপত্র দক্ষতার সঙ্গে গুছিয়ে ফেলতে শুরু করল। রজত দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল। দেয়ালে ঝোলানো বাবার বড় ছবিটা খুব সাবধানে নামাতে বলল। নামানোর পর দেখে বেশ ধুলো

জমেছে। কাপড় দিয়ে পরম যত্নে নিজের হাতে ধুলো ঝেড়ে মুছে বাবার ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল রজত। কেমন উজ্জ্বল আর স্পষ্ট দেখাচ্ছে বাবাকে। ছবিটা কবে তোলা হয়েছিল রজতের এখনো মনে আছে। বাবা রিটায়ার করার পর হাতে টাকা পেয়ে ছোটছেলেকে একটা দামী DSLR ক্যামেরা কিনে দেন। বাবাকে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়ে প্রশান্ত প্রথম সেই ক্যামেরায় এই ছবিটা তোলে। পরে বাঁধানো হয়। আজ কতদিন হয়ে গেল বাবা নেই। বাইরে থেকে খুব আদর্শবাদী, কঠিন মনে হলেও বাবার মনটা ছিল নরম।

সে বছর হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল পরীক্ষা দেবে রজত – তখন শীতকালে পরীক্ষা হতো। প্রমথনাথ ভোরে উঠে ছেলেকে তুলে দিতেন। রজত পড়তে বসত। অসময়ে বৃষ্টি হ'ল সেবার। ভোরে ওঠার জন্য ঠাণ্ডা লেগে কাশি হ'ল। প্রমথনাথ নিজের গায়ের খাদির মোটা চাদরটা ছেলের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে দিলেন। পরীক্ষায় পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার পর শীতকালে মা চাদরটা হাতে দিয়ে বলল, "এই খাদির চাদর বাবা তোকে দিয়েছে। বেশ গরম হয়। তোর তো ঠাণ্ডার ধাত, তুই নে।"

সেই থেকে পুরো কলেজ লাইফ, তারপরও পুরো শীতকাল রজতের গায়ে থাকত ওই খাদির চাদরটা। রাতে গায়ে জড়িয়ে শুতো। লেপ কম্বল তার সহ্য হতো না। কলকাতায় আসার পরও ওটা ওর সম্বল। চাদরটা গায়ে দিলে কেমন বাবা বাবা ভাব হয় তার। শরীরের মধ্যে একটা শিকড় চাড়িয়ে যায়। উত্তরাধিকার! বাবা নেই, কিন্তু সেই খাদির চাদর আজও আছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। সব বাঁধাছাঁধা করে সেন্টারের ছেলেরা আজকের মতো চলে গেছে। রজত স্নান সেরে বেরিয়ে ঘরে এসে তাতাইয়ের খোঁজ করে। তাকে দেখতে পায় না। সুদীপা বলে, "হয়তো, ওর ঠাকুমার কাছে আছে, ডাকছি।"

ডাকতে হ'ল না। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নাচতে নাচতে তাতাই ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন তার ঠাকুমা।

"কী মজা! কী মজা! আমি চাদর গায়ে দিয়েছি। বাবার চাদর! আমি এটা নেব।"

রজত দেখল, ছোট তাতাই তার বাবার দেওয়া সেই খাদির চাদরটা গায়ে জড়িয়েছে। দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে, যেন চাদরটা ওরই; আর ছাড়বে না। রজতের চোখে জল এল। মৃত বাবার মুখ ভেসে উঠল। পরম স্নেহে ছেলেকে কাছে টেনে গাল টিপে দিয়ে বলল, "বেশ। তোকে দিয়ে দিলাম চাদরটা। বাবা আমাকে দিয়েছিল, আমি তোকে দিলাম। খুশি তো?"

ছোট তাতাই খুব খুশি হ'ল। বাবাকে একটা হামি দিয়ে সে মায়ের কাছে ছুটে গেল – "আমার চাদর, মা আমার চাদর।"

ঠাকুমা সুধারানীর চোখ সজল হ'ল। তিনিও খুব খুশি হলেন এই উত্তরাধিকার বদলে।

নতুন বছর আসে

মিলি দাস

সামান্য একটু তো জীবন
মাটির কাছে থাকি,
অন্ধকারে হেঁটে বেড়াই
জ্যোৎস্না গায়ে মাখি।

আকাশ বাতাস ছায়াঘেরা
সোঁদা পাতার গন্ধে মোড়া
আমার গ্রামের প্রতি ঘরে
শেকড়ের টান দেখি।

গরুর গাড়ির চলার পথে
যজ্ঞ ডুমুর হাওয়ায় নাচে
কায়েঝিঙের ফুলগুলোকে
কোলের উপর ডাকি।

বাতাবি আর নোনার রঙে
কাঞ্চন ফুল অলস ঢঙে
আম্রমুকুল ছড়িয়ে দিয়ে
সুখ-বিছানা পাতি।

মনসা গাছ সাজিয়ে নিয়ে
কুলোর উপর অর্ঘ্য দিয়ে
পাড়ার যত ছেলে মেয়ে
হ্যাঁচড়া মাকে স্মরণ করে
সমস্বরে হাঁকি।

অতীতঘেরা স্মৃতির মাঝে
কলকে ফুলের একটু লাজে
গোবরমাখা মায়ের হাতটা
মনের ভেতর ভাসে,
এমন করেই দৌঁড়ঝাপে
মেঘ রোদ্দুর সংলাপে
স্মৃতিঘেরা পুরনো যায়
নতুন বছর আসে।

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

সুস্থ-সবল দেহ মনে, প্রাণ আছে নির্ভয়ে,
তোমারি আশ্রয়ে আছি, তোমারি আশ্রয়ে।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, যেমন অসীম শূন্যে,
আমরা সকল সেই অসীমে, তোমার আশিস পুণ্যে।
সেই অসীমে চেনাও হে নাথ, একটি পরিচয়ে,
তোমারি আশ্রয়ে আছি, তোমারি আশ্রয়ে।

যখন যেমন যেথায় থাকি, রাখি তোমায় চিন্তায়,
তোমার করুণাতেই কাটে, নিরাপদে দিন তাই।

গাছপালা আর প্রাণীজগৎ কয় কথা সেই সুরে,
আমরা তোমায় বুদ্ধি দিয়ে সরিয়ে রাখি দূরে।
চিনিয়ে দিও সবায় তোমায়, সকল বুদ্ধিজয়ে,
তোমারি আশ্রয়ে আছি, তোমারি আশ্রয়ে।

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

গৃহের মাঝে শান্তি খুঁজি, শান্তি কি আর মেলে?
শান্তি দেখি মনের কোণে, লুকিয়ে অবহেলে।

শান্তি লাগি দুষছি সবে, চোখের সামনে পাই যা,
তবুও শান্তি মেলে কোথায়, হয়রানিরই দিন তা।
যেই ভেবেছি শান্তি পাব, যা ইচ্ছে তাই বলে,
শান্তি দেখি মনের কোণে, লুকিয়ে অবহেলে।

শান্তি পাবি সেদিন যবে শান্ত করে মনটা,
আর সবারে না দোষ দিয়ে, খুঁজবি নিজের দোষটা।

সেদিন দেখিস মন ভরিয়ে, বাজবে শান্তি সুরে,
সকল অভাব ঘুচবে সেদিন, মনের অন্তঃপুরে।
সেদিন কি আর লুকিয়ে রবে এমন অবহেলে?
শান্তি সেদিন সকল দিকে, এই পৃথিবীর কোলে।

আজও বহমান

সুব্রত ভট্টাচার্য

বইত প্রেম উচ্ছ্বাসে নিবেদিত হৃদয়কে
কতদিন আর অবদমিত করে রাখা যায়!
মন্দাকিনী তোমার,
বাঁধ ভাঙার জলের স্রোতকে
কোন শক্তিতে বাঁধা যায়?
অলকানন্দার হৃদয়ে বইছে অতৃপ্ত রক্তক্ষরণ
বুকের পাঁজরে ভাঙনের সুর –
তবুও স্রোতস্বিনী তোমার গভীর তলে আমি
আজও অবগাহন করি
স্রষ্টার সৃষ্টি তুমি আজও আমায় ছেড়ে কত দূর।
ডুবতে চাই উষ্ণ আভায়
পুড়ছে পুড়ুক ও দূরে
বৃষ্টিঝরা ভোর, আহা কী মধুর আহ্বানে
কানে বাজে রিনিঝিনি কাঁকনের সুরে।
অলকানন্দার কাছে আমি ভীষণ দামী
আমিটা তার প্রিয়জন
দহন ছাড়া বুকের বিরহ ক্ষতটা সারাতে
মন্দাকিনী, আমার কাছে তুমিটা বড্ড প্রয়োজন।
অলকানন্দা তার মনের বদ্ধ কুটিরে
আমার একটা নিজের জায়গা ছিল
আপন খেয়ালে বইত সে
ভাঙত পাহাড়ের পাথরগুলো,
তবুও তুমি আমার পরিপূর্ণ
পাহাড় নদী সাগর
আমার স্বপ্নগুলো পূরণ করত বেহিসাবী ইচ্ছেগুলো।
সদাচঞ্চলা সুহাসিনী
শ্রাবণ বেলায় উথাল পাথাল
এ কোন ঢেউ খেলে ষোড়শিনী।
উদাস দুপুরে চেয়ে আছি দূর সীমানায়
মনটা চলে যায় আপন খেয়ালে
বইছ যেখানে আজও সেই কিশোরীবেলায়।
খেলা করার নামে ছুটতাম দেখতে তোমায়
চোখের ভাষায় শুধু কথা হতো চোখে চোখে
পূর্ণিমার চাঁদ উঠুক বা না উঠুক
ভালবাসা গড়াত আদর সোহাগ মেখে!
কী এক মায়াজালে কিন্নরী কণ্ঠে
ওগো মন্দাকিনী কেন বেঁধেছিলে আমায়?
বেলা শেষে চিনে নেয় শিশুর মাতনে
বিষণ্ন মন পোড়ে নীরবতার আগুনে।

মহাসমুদ্রের রংধনু সেতু

রঙ্গনাথ

এক মহাসমুদ্র পার হব
এপারে শুরু করে যাব ওপারে;
রংধনু সেতুর উঁচু-ঢালু পথ
শেষপ্রান্তে নিয়ে যাবে আমারে।

কী সুন্দর মনোহর এ রংধনু সেতু –
প্রশস্ত, বিরাট, মজবুত গঠন।
দু'ধার বিচিত্র রঙিন, উপরে আকাশ
সমুদ্রের ঢেউ নীচে বহে অনুক্ষণ।

সেতুটি কতটা লম্বা, কতটা উঁচু
এতকিছু জানার নেই দরকার;
জানি, যেতে হবে সারাটা পথ
এপারে শুরু হবে, শেষ ওপার।

নীচ থেকে যাত্রা হ'ল শুরু –
সেতুর উপরে চলছি তো চলছি
দেখি না পথের শেষ প্রান্ত
উপরে উঠছি, উঠছি তো উঠছি।

রাখি না কোনো সময়ের হিসাব –
শুরু করেছি, হবে শেষ করতে;
দূরত্ব কমে আসছে ক্রমাগত –
এবার পৌঁছালাম ঠিক মাঝপথে।

ভাবলাম, আরো অর্ধেক বাকি
একটু থামলাম জিরিয়ে নিতে;
ঢালু পথ দেখে খুব খুশী হলাম –
এ অর্ধেকে হবে কম সময় দিতে।

এবার তাড়াতাড়ি চলে যাব –
ঢালু পথে নামতে সময় বাঁচবে বেশ
সর্বদা এই হয়, এটাই নিয়ম
শীঘ্র রংধনু সেতু-যাত্রা হবে শেষ।

ভাবছি, যারা দ্রুতবেগে গেছে
আমার আগে পৌঁছে গেছে তারা
আমিও পিছনে ফেলে এসেছি
আস্তে-ধীরে আসছিল যারা।

দেখি না ফেরৎ আসছে কেহ!
তাই চিন্তা, শেষপ্রান্তের জন্য –
কেহ অন্য কোথাও না গেলে
মাঠঘাট পাব লোকে লোকারণ্য!

পৌঁছে দেখি কেহ নেই, একফালি মাঠ
দীর্ঘ দেয়ালে মাত্র একটি রঙিন দুয়ার।
বুঝলাম, দুয়ারে ঢুকলেই হারিয়ে যাব –
সেতু-যাত্রার সমাপ্তি ভারি চমকদার!

অপেক্ষা

সুব্রত ভট্টাচার্য

পরজন্ম বলে কিছু থাকে যদি
আবার আসব ফিরে, তোমার কাছে নিয়মের কালে,
নতুন করে সূর্য উঠবে দিবস হবে পুনরায়।
নতুন করে কিছু নিয়ে লিখব তোমার মাঝে,
যা কিছু হারিয়েছে এই জন্মে
সব কিছু গড়ে নেব তোমাকে নিয়ে।

বিষণ্ণ প্রহরগুলো হৃদমনে নিভৃতে দীপ জ্বালায়
দীর্ঘশ্বাস বাতায়ন বুকঅলিন্দে শিশিরস্নানে সিক্ত হয়
বিষণ্ণ ঠোঁটে আজন্ম তৃষ্ণাগুলো মধুর নির্যাস মিলনের
অবগাহনে ডুব দেয়,
উদাস দুপুরে মনহারানো মনের মাঝে,
জীবনের প্রশ্নগুলো জন্ম নেয়!

বলাকার মন নিয়ে সেদিন তোমার কাছে উড়ে যাব
তখন কথা হবে, শব্দ ছন্দ কবিতায়,
প্রেম আর ভালবাসার।
নীলের সাথে থাকবে
কিছু বকুল ফুলের গন্ধ! গোলাপের নির্যাস!
আর সমর্পিত স্নিগ্ধ সকালের কিচির মিচির পাখির ডাক!
বুকপকেটে রাখা থাকবে কয়েকটা ছন্দ
শুধু তোমার জন্য!

এখন আর নেই তায়, এই নিশিরাতে,
কোনো আলো নেই,
সারারাত হারানো ভয়।
নিকষ কালো রাত্রি, শুধু আমার জন্য,
রাত শেষেও মনে রেখো আমায়,
আমি থাকব জন্মান্তরের অপেক্ষায় তোমার সাথে,
ঐ দিগন্ত মিশেছে নীল সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে,
ঐ শোন, সমুদ্রের উথাল-পাথাল ঢেউ
কী কথা বলতে চায় সে...
শুনেছ কি তুমি বা কেহ?

হৃদয়ের ক্যানভাসে তুমি,
অনুরাগের রঙে তুমি,
তুলির সুনিপুণ আঁচড়ে তুমি,
ভালবাসার প্রতিকৃতি তুমি।
রাত্রিশেষে ভোর বা বৈশাখের খরতাপে তুমি
ভাবনার অভ্যেস নিয়ে জীবনটা হতাশায় ভরে গেছে,
আশা-ভালবাসা সীমান্তে দিয়েছে পাড়ি।
শুধু এই ক'টা দিন –
একাকীত্বের সহ্যহীন যন্ত্রণাময় প্রহরগুলো নিয়ে
কেটে যাক অপেক্ষায়
নিয়মের অঙ্কের খাতাটাতে

বসন্ত এল

শঙ্কর তালুকদার

সারারাত দখিনা বাতাস
চাঁদের আলোর সম্ভার
খুঁজে ফিরি কারে
বনের ছায়ে একা শুয়ে
লিখি স্মৃতির পাতায়।

ভুলে যাই
কার কথা যেন
মৃদু হাসে চাপা পড়ে
শুধুই রিণিরিণি
ঘুম নেই আজ
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বিস্ময়ের ছোঁয়া
তেমনি পলাশ ফোটে
হলুদে আর লালে
জোছনায় শরীরে
যেন নতুন গন্ধ।

প্রেমের সময় এসেছে
তরী তাই ঘাটের কিনারায়।
পিপাসায় দল বেঁধে
তারই আশেপাশে
জুটেছে মায়াবী মন
আজ বসন্ত উৎসব।
অনেক পায়ের শব্দে
জেগে উঠি
ভালবাসা বিচলিত
হবে কি মিলন,
আবার এই পূর্ণিমায়।

বসন্ত, হে বসন্ত
দাঁড়াও ক্ষণিকের তরে
আমার মালাগাঁথা
এখনো হয়নি সারা
যেও না, ফিরে এসো
মালা পরাব সযতনে।

কবে বলব

শঙ্কর তালুকদার

হোক পুরাতন
তবু সিন্ধুর জলে
বেঁচে ফেরে সভ্যতা।
আকুল তুমি
তাকে শ্রদ্ধা জানালে না
ছুটে গেলে সভ্যতার
অক্লান্ত আগুনে,
যেখানে পুড়ে মরে বসত।
কালো নিবিড় চুলে
মমতাঘন স্বপ্নকে
কেউ ছুঁয়ে দেখল না
খুঁজতে গেল
ইঁট কাঠের অস্থিমাঝে
যার আছে আকার
নেই প্রাণের সঞ্চার।
আগুন জ্বেলে
তুমি বসে রইলে
কার অপেক্ষায়?
কেউ কাছে এসে
বলল কি, খাবে চলো!

ভালবাসা ছিল

সুজয় দত্ত

ভালবাসা ছিল আধোজাগা রাত চুপিচুপি অভিমানে।
ভালবাসা ছিল কুমকুম টিপ্ দুচোখের মাঝখানে।
ভালবাসা ছিল হৃদয়ে যা ধরে তার চেয়ে বেশী চাওয়া।
ভালবাসা ছিল দুপুরের ছাদে একরাশ খোলা হাওয়া।
ভালবাসা ছিল অকারণ সুখে ছলোছলো আঁখিপাতা।
ভালবাসা ছিল দেরাজে লুকোনো কবিতার ছেঁড়া খাতা।
ভালবাসা ছিল হাতে হাত রেখে দৃপ্ত অঙ্গীকার।
ভালবাসা ছিল দেওয়ানেওয়া খেলা, নেই জিৎ নেই হার।
ভালবাসা ছিল একে অপরের পথ চেয়ে কাটা দিন।
ভালবাসা ছিল তিলে তিলে জমা শুধতে না পারা ঋণ।
ভালবাসা ছিল স্বপ্নকে ছুঁয়ে পাশাপাশি পথ চলা।
ভালবাসা ছিল নিভৃত মনের নীরবে কবিতা বলা।
ভালবাসা ছিল খুনসুটি আর টুকরো মজায় মিঠে।
ভালবাসা ছিল পুরীতে দীঘায় নন্দনে পার্কস্ট্রীটে।
ভালবাসা ছিল ভুল বোঝাবুঝি, কথা কাটাকাটি, রাগ।
ভালবাসা ছিল বুকভরা ব্যথা, গভীর ক্ষতের দাগ।
ভালবাসা ছিল – ভালবাসা ছিল আমাদেরই মাঝখানে।
আজ পড়ে আছে স্মৃতিটুকু তার – বাকীটা সময় জানে।

আমার যুদ্ধ

সুজয় দত্ত

আমার বাগানে ডালিম গাছেতে ফুল ধরেছিল কাল।
মধুলোভী যত ভ্রমর মাতায় তার সুবাসের রেশ।
হঠাৎ আকাশে উড়ে এল এক নির্মম মিসাইল –
তছনছ হ'ল সাজানো বাগান, গল্প হ'ল না শেষ।

আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে গেছে ছায়াছায়া বনপথ।
মুখরিত থাকে পাখীর কূজনে, শুনি কুহু আর কেকা।
হঠাৎ কী হ'ল – সব চুপ। শুধু যান্ত্রিক এক ধ্বনি –
শত শত ড্রোনে ছেয়েছে আকাশ, সূর্য পড়েছে ঢাকা।

আমার গাঁয়ের পশ্চিম পারে কুলুকুলু নীল নদী
বয়ে যেত। তার জলেতে মরাল, রামধনু-রং মাছ।
একদিন শুনি মাইন পেতেছে কারা তার মোহনায় –
রণতরী আর ডুবোজাহাজের চলছে মৃত্যুনাচ।

সেই নদীতীরে দাঁড়িয়ে দুদিকে যতদূর যায় চোখ
দেখা যেত শুধু ধানক্ষেত আর সর্ষেক্ষেতের আল।
আজ সেথা শুধু গ্রেনেডের আর মর্টারের ক্ষতচিহ্ন –
মাটি খুঁড়ে নাকি বানিয়েছে ট্রেঞ্চ শত্রুপক্ষ কাল।

এমনি করেই চেনা পৃথিবীটা বদলে হয়েছে অন্য।
যুদ্ধ হচ্ছে আমাকে বাঁচাতে, আমারই ভালর জন্য।
এত ভাল হায় সইবে কি শেষে? জয় করে নিতে বিশ্ব –
ফুল-নদী-বন পাখীর কূজন হারিয়ে হলাম নিঃস্ব।

তাই আমি আজ রণক্ষেত্রে সামিল হয়েছি নিজে।
ঝাঁপিয়ে পড়েছি শত্রুবিজয়ে, হাতে কবিতার অস্ত্র।
আমার শত্রু তারা, যারা এই পৃথিবীকে করে ধ্বংস –
ড্রোন-মিসাইল-বোমারুর ভয়ে থাকব না সন্ত্রস্ত।

আমার কবিতা বেয়োনেট হয়ে হিংসাকে করে বিদ্ধ।
ফ্লেম-থ্রোয়ারের আগুনে পোড়ায় শান্তির প্রতিবন্ধ।
আমার কামানে ভালবাসা ভরা, বন্দুকে বন্ধুত্ব –
মানবিকতার শক্তিতে রোখে পারমাণবিক দ্বন্দ্ব।

অন্ধকার যাত্রা

দীপশিখা চক্রবর্তী

আলোর পিঠে পুড়তে থাকে জমানো পান্ডুলিপির শোক,

যান্ত্রিক করতালি,
হইচইয়ের গান,
থেমে যায় সব!
গলগল করে বেরিয়ে আসে অক্ষরদের গা-জ্বালানো কালো হাসি;
মুছে দিতে যতবার গোপনে উড়িয়ে দিয়েছি একটা সাদা রুমাল,
ফিরে ফিরে আসে!
এগিয়ে যেতেই তাদের না-থাকাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে,
কীসের অপেক্ষায় একা একা পুড়ছে,
জানি না!

হয়তো এক্ষুনি ক্ষতচিহ্ন খুঁজতে ঝমঝমিয়ে নামবে রাত,
আবার হারিয়েও ফেলবে কখনো;

শুধু এক বিশাল শূন্যের খেলা,

হেঁটে যায় কবি এক ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যাপ্রবণ কবিতার অন্ধকারের পথে।

অলীক

ব্রতী ভট্টাচার্য

তুই যেদিন বললি ব্যথার রং খয়েরি কিংবা বেগুনি
আমি বললাম হয়তো,
তবে তুই ব্যথা দিলে রং হবে ছলকানো লাল
ধোঁয়া উড়িয়ে হেসেছিলি তুই।
তোর সেই হাসি হালকা মেঘের মতো
আউটরাম ঘাট পেরিয়ে ছড়িয়েছিল
সূয্যি ডোবা আবছায়া অপার দূরত্বে
সেই থেকে কত গোলাপী, হলুদ, বিকেল, সকাল
এল আর গেল
লাল মেঝের গাঘেঁষে তামাটে দুপুর
কত নিবিড় ঘুমিয়ে রইল তোর ঘামে, আদরে...
জেগে রইল নিকষ কালো রাত তারাদের আলো গুনে...

ইনফিউশন কফির বাদামী আশ্লেষে,
হেলাল হাফিজের কবিতার নীলে
কিম্বা সুমনের 'জাতিস্মর'-এর অবুঝ সবুজে
কোথায় রাখব তোকে? আমি দিশেহারা –
তোকে শুধু দেখব বলে
সম্ভব আর অসম্ভবে তফাৎ করিনি কোনো
আকাশ উপুড়করা শ্যাওলারঙা আধডোবা শহরে,
এসপ্ল্যানেডের জমাট ট্রাফিক কিংবা কারফিউ ব্যারিকেডের
লাল কালো দিনেও মরিয়া আমি।

সত্যি বলার দায় ছিল না তোর –
রামধনু বুদবুদ কতটা অলীক জানি তো সকলে
লাল রং, খয়েরি বেগুনি হয়ে কখন যে বেরং হ'ল
কেবল কল্লোলিনী তার খোঁজ রাখে
আদরের সাদা নরমে ঢেকে রাখে সেসব ব্যথা... তোর আমার।

আগুনে পাখি

নিবেদিতা গাঙ্গুলী

একটা প্রকাণ্ড আগুনে পাখি,
রোজ বসে থাকে নিশ্চিন্তে
মেঘেদের স্বর্ণ শিখরে।
দুই দিকে প্রসারিত থাকে
ঘন পালকে গাঁথা পোক্ত দুটি ডানা,
ফেলেঝেলে রোদ মাখে একা একা।
চোখে তার সহজাত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি...
আধবোজা চোখে দেখে নেয় সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ।
অপর্যাপ্ত উত্তাপ পায় শরীরের প্রতিটি পালক,
তবু তার বর্ধিত অসন্তোষ আর অতৃপ্তি।
ইচ্ছে হলেই সে বিস্তৃত করে তার ঘুমন্ত ডানা
বিষণ্ন হয় আকাশের অনন্ত মুখ।
তার আকণ্ঠ তেষ্টা মেটাতে
বন্ধ্যা মেঘমালা হয় উর্বর, সুজলা।
পাখিটার নিয়মিত আসে অনিয়ম ক্ষুধা,
সন্ত্রস্ত মাঠ অসময়ে দেয় অফুরন্ত শস্য।
এমনকি তারই প্রবল বাসনায়
গাছের শীর্ণ শাখায় হয় নতুন প্রজন্ম।
চিরকালই সে এক জীবন্ত আগুনে পাখি,
যার কোন জন্ম নেই মৃত্যু নেই...
যে কেবল মেঘের আড়াল থেকে
কান পেতে শুনে নেয়
হাজারো পাখির ক্লান্ত ডানার উড়ে চলার একত্র শব্দ
তবু যারা এক হতে পারেনি কোনদিন।
যাদের কেবল আছে বিশ্রামহীন ওড়া
এরা যুদ্ধ করে চলে চিরকাল,
তবু তাদের জয় নেই। কেবল তারা
অনিশ্চিত অন্ধকার থেকে উড়ে চলে আরও অন্ধকারে।
সেখানেও শুধু অপেক্ষায় থাকে সেই আগুনে পাখি।
এখানে এরা চিরকাল বিভক্ত...
আর ওখানে আগুন পাখিটা
কোনদিন ভাগ করে খেতেই শেখেনি।

উপেক্ষায়

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

আরো দ্রুত ক্ষয়ে যায় আয়ু
শতপাকে ঘিরে রাখে জীবনের শোক
শকুনের খুবলে নেওয়া মাংস পড়ে থাকে
অভুক্ত পশুরা এসে চলে যায় গন্ধ শুঁকে
পাঁশুটে রঙের অদ্ভুত রোদ এসে
খটখটে করে দেয় বীজতলা

গলিত সময়
ভালবাসা মিথ্যে কিছু স্তোক
কুয়োতে ঢুকিয়ে মাথা
প্রতিবিম্ব দেখে উৎসুক
অনিশ্চিত আড়ালে হারায়

তবুও তো ভালবাসা আসে
কৃষ্ণের মধুর বাঁশিটি
বারবার রাধা সুরে বাজে
ভাল লাগে এ জীবন অমিত লাবণ্যে

ঐ অন্তহীন নীল বুকে

নার্গিস পারভিন

আকাশরঙা ছেলে –
তোমার রেশম-নরম চুলে বড্ড লোভ আমার।
মনে পড়ে আকাশরঙা,
তোমার তেপান্তর পার করার স্বপ্নচোখে কতটা সম্মোহন
রেখেছিলে সেদিন!
তোমার কাশফুল চুলে জড়িয়ে গেলাম সব ভুলে।

ঐ নীল বুকে অন্তহীন সম্মোহন আজও
আমি আহ্লাদী ফুল্লরা আজও আটকে আছি তোমার বারমাস্যায়।

জানি,
তোমার শান্তদীঘি বুকে লুকিয়ে আছে
এক সমুদ্র পাহাড়ী ঢেউ!

এসো হে বৈশাখ

বৈশাখী চক্কোত্তি

কবিতা লিখলে পেট ভরে না
কবিতা লিখলে সমস্যা কাটে না
কবিতা লিখলে হয়তো নাম কেনা যায়
কবিতা লিখলে অর্থ লাভ হয় না।

রাস্তার উলঙ্গ শিশু ছেঁড়া কাঁথায়
চিৎকার করে জানান দেয় অস্তিত্ব
শুকনো স্তনে আর ঝরে না অমৃত
বোধ বুদ্ধি সব আজ শুধুই মৃত।

বাসি খাবার আঁস্তাকুড়ে
পাগলে কুকুরে মারামারি
সেই দৃশ্য আজ অতি সরল
শূন্যতার গ্রাসে চারিদিক ভারী।

পরিযায়ী শ্রমিকগুলো
রেল লাইনেই চিরনিদ্রায়
ঘরের লোক দিন গোনে
দীর্ঘ শোকে অপেক্ষায়।

চার বছরের মহামারীর রেশ
সারাবিশ্বে এখনো তার জলছবি
প্রতাপশালীরা নিজের আখের গুছোয়
শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতির দরজা বন্ধ সবই।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি
চুপিসারে পিছনের দরজা খুলে
তথাকথিত সমাজসেবকেরা হাতে
চাকরির প্রহসনে নেয় টাকার থলি তুলে।

চারিদিক অন্ধকারময়, পঙ্কিল, নিঝুম
তারই মাঝে সময়ের চাকা চলে ঘুরে
দিন যায়, রাত আসে, কার লাগি কার আশে
মাস যায়, বছর শেষে বৈশাখ সহর্ষে ফেরে।

কবিতা লিখলে যদিও পেট ভরে না
কিন্তু কবিতা দেয় সানন্দে আহ্বান
নতুন ঊষা, নতুন দিনমণির সাথে
হোক পুরাতন যত কালিমার অবসান।

গ্লানি মুছে, জরা ঘুচিয়ে হোক শুচি
ধরা পুণ্য অগ্নিস্নানে, কবিতা তোমার
জয়ধ্বনি দেয়, "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো"
অন্ধজনে দাও গো আলো, মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ
মহাবিশ্বে ধ্বনিত হোক, বৈশাখের জয়গান।

হৃদয় প্রস্তর

উদ্দালক ভরদ্বাজ

নক্ষত্র হারিয়ে যায়, উল্কাপিণ্ড এইমাত্র
ধেয়ে গেল অনিবার্য ধ্বংসের দিকে
থমথমে কালো আকাশে দু'একটা উদাসীন মেঘ
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে
পিচের রাস্তায় কালোর রকমফের, ভিজে দাগ শুকনো ডাঙ্গায়
যেমন উল্কাপিণ্ড, হারানো নক্ষত্রমালা, পোড়া বুকে, ফেলে যাওয়া
পায়ের চিহ্ন তোমার, আমি ধরে আছি, থাকি...
যেন আরাধ্য প্রতিমা, পাথরে, চন্দনে, ঘ্রাণে... শুকোনো মালায়
ধূপের পবিত্র গন্ধ, দুলে যায় মৌসুমী হাওয়ায়
চেয়ে থাকে অপলক, নির্বাক গাহনে
এঁকে দেয় রক্ততিলক | করুণায়? প্রেমে?
কৌণিক দ্বিধায়?

স্পষ্ট নয় কিছুই, ইঙ্গিতে, আয়োজনে তবু, নিভৃতির প্রয়োজনে
দাঁড়ায় হৃদয়চ্ছায়ে, হরিণীর মতো সেই প্রাণ
মনের মন্দিরে হয় পূজা, ফিরে যায় তারপর, বেলাশেষে
আপন কুলায় | দিনের সূর্য নিভে গেছে তখন
আবার রাত্রির আয়োজন, নক্ষত্রপতন
উল্কার একক অভিসার
অন্তহীন রাত্রির গায়ে...

চিঠি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

চিঠি মানেই খামের আঠা
চিঠি মানেই অনেক কথার
আবেগ কিম্বা হয়তো কাজের
চিঠি মানেই ইতি তোমার।

চিঠি মানেই সূর্য-ওঠা
ভোরের আলোয় পোস্টম্যানের
নীল পোশাকের ম্যাজিক এসে
খটখটানো মনের দ্বারে...

মন তো এখন কোন বিবাগী
স্বর্ণপুরে, তাও জানি না
মন তো এখন দুঃখ পেয়ে,
অজানা-রঙ কুসুম ছুঁয়ে,

লুটিয়ে কাঁদে কোন সে ভুঁয়ে
ঘুরে বেড়ায় উদাস চোখে
লটরপটর চুলের বোঝা,
"কেউ বোঝে না", "কেউ বোঝে না"

বলতে বলতে ঘুরে বেড়ায়
পাগলসম, পাব কোথায়
তাকে আমি? তাই লিখি না।
তাই লিখি না, তাই বলি না

চিঠির মতো, মনের ক্ষত
সাজিয়ে রাখি গানের মালায়
ফিরবে যেদিন সেই কুমারী
পরাব তার সোনার গলায়।

এখন কথা তাই তো সুরে
কাঁপতে থাকে ভোরের আলোয়...
এখন কথা তাই তো খামের
বন্ধ ঘরে থাকবে না আর।

তোমার আমার কথার সে মেঘ
অনেক বৃষ্টি ঝরিয়ে গেছে,
এখন চিঠি বন্ধ বাক্সে
থাক ঘুমিয়ে কুলুপ এঁটে।

জাগব যেদিন কথার ভোরে,
নীল সে গাঢ় অন্ধকারে
খুঁজব চিঠি, ধুলোর, ঝরা
পাতার পাহাড় সরিয়ে ফেলে।

প্রেমাধার

শান্তনু মিত্র

ঘনঘোর মায়া আঁধারের ছায়া
ওই দিগন্ত পারে।
এসে গেছি আমি সুরলোকগামী
বিমানের বন্দরে।

সারা সব কাজ, ফকিরের সাজ
বহু দূর দেব পাড়ি।
ওজনের কলে ঝুলিখানি তুলে
দেখিছে সেবিকা নারী।

মনে সংশয়ে সেই নারী কয়
গলার স্বরটি নিচু
"বড় বেশি ভার সঙ্গে তোমার?
কী নিয়েছ এত কিছু?"

দেখালাম তাকে 'বিরহ' মোড়কে
ঢাকা আছে কিছু 'ব্যথা'।
কৌটোতে ভরে রাখা আছে ধরে
আমার 'না বলা কথা'।

'ঝগড়া বিবাদ' সাথে 'প্রতিবাদ'
রেখেছি অল্প করে।
'মান অভিমান' কিছু 'অপমান'
নিয়েছি পাত্রে ভরে।

"নেবে এই সব? সেকি সম্ভব?"
সে বলে আকুল হেসে,
"এসব নেবার নেই অধিকার
রেখে যাও নিঃশেষে"।

করি অনুনয় "হও গো সদয়।
এই কথাটুকু রাখো।
'স্মৃতি' দিয়ে গড়া 'মালা' একছড়া
যত্নে এনেছি দেখো।

বাকি মূলধন নেই প্রয়োজন
ফেলে দাও অবহেলে।
শুধু ঝুলি থেকে দাও গো আমাকে
সেই 'মালা'খানি তুলে।"

চোখের পলকে হয়তো আমাকে
দেখল যেন সে চেয়ে।
ক্ষণকাল পরে, কিছু দ্বিধাভরে
"সে হয় না" বলে মেয়ে।

"তবে হোক তাই শুধু বলে যাই
ক্ষমা কোরো সুন্দরী।
একটি আমার দামী সম্ভার
লুকিয়ে করেছি চুরি।

যত ছিল ভার ঝুলিতে আমার
বিচার করেছ তার।
'ভালবাসা'ভরা একটি পসরা
অলখে ছিল তোমার।

সকল হারিয়ে রয়েছি দাঁড়িয়ে
যেন 'প্রস্থান' দ্বারে।
সেই 'প্রেমাধার' নিয়েছি আমার
হৃদয়ে গোপন করে।

মনসঙ্গীত ৩

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

মিথ্যে বলে যে সবারে টানছে অধঃপাতে,
‘প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বড়’ ভাবছে দিনেরাতে,
তার সে অহংকারের সীমা কোথায় হবে শেষ?
সত্য কবে জ্বালবে আলো ধরবে জয়ের ধ্বজা,
অসুন্দরের দিশা ছেড়ে পথ দেখাবে সোজা,
চিনবে সবাই স্বরূপ কি তার ঘুচবে মিথ্যা বেশ!
তার সে অহঙ্কারের সীমা এবারে হোক শেষ।

বাঁচাও সখা, বাঁচাও নীতি, চায় পৃথিবীর সুখ,
দম্ভ দিয়ে জোর দিয়েছ মিথ্যেভরা মুখ,
তার হাতে যে যায় ঘুচে সব বাঁচাও মহান দেশ,
তার সে অহঙ্কারের সীমা এবারে হোক শেষ।

নিজের স্বার্থ সবটুকু তার, আর বাকি সব মিছে,
সমাজ জুড়ে তার তাঁবেদার ছুটছে তারই পিছে,
থামাও তাদের সে কলরব ঘুচাও মনের দ্বেষ,
তার সে অহঙ্কারের সীমা এবারে হোক শেষ।

প্রমাণ হলে সত্য কী তা, শাস্তি যা তার হোক,
কেউ বড় নয় তোমার চেয়ে কেউ না করুক শোক,
ঘুচিও তার এই মিথ্যে বলা সত্যের থাক রেশ,
তার সে অহঙ্কারের সীমা এবারে হোক শেষ।

মরণ অবধি বেঁচে থাকা

রঙ্গনাথ

মরণ অবধি বেঁচে থাকবে –
অত চিন্তা কেন মরণ নিয়ে?
ক’দিন বাঁচবে জানো নাতো
চিন্তার শুরুটা হবে কী দিয়ে?

বেঁচে আছ এই তো ভাল
এর চেয়ে বেশী কী আর চাও?
মরণ আসতে যখন দেরী
তখন কীসের জন্য ভয় পাও?

যে পথের নেই ঠিক সীমানা
তা তো অল্প-বেশী হতে পারে;
সে পথের এক পথিক হয়ে
থেমে থাকা যে মানায় নারে।

দিনকাল কাটাও খুশী মনে
নিজেকে ব্যস্ত রাখো অবিরত;
মরণ যখন নাছোড়বান্দা
সে আসুক না তার সময় মতো।

গল্পের নাম পর্ব দুই

নিবেদিতা গাঙ্গুলী

গরম কফির ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে এল, "আর ইউ দেয়ার? হাউ ওয়াস ইওর ডে?"

কম্পিউটার স্ক্রীনের ওদিকের লেখকের নাম প্রীতীশ দত্ত | আসল নাম; কি নকল নাম, তা বলা মুশকিল, অন লাইন তো!

কম্পিউটার স্ক্রীনের এদিকে অতসী বোস | মাস দুয়েক আগে হঠাৎ এক রাতে অন লাইনে আলাপ | আর এখন? প্রায় প্রতি রাতের অভ্যাস | ডিনারের পর এক কাপ কফি নিয়ে রোজ বসে থাকে অতসী কমপিউটারের সামনে | কিন্তু কীসের অপেক্ষায়?

অতসী– "ইয়েস, আই অ্যাম হিয়ার... অ্যান্ড রিয়্যালি নাথিং আনউসুয়াল, জাস্ট অ্যানাদার ভেরী বিসি ডে |"

প্রীতীশ– "সো, টেল মি লিটল্ মোর অ্যাবাউট ইউ |"

অতসী– "নাথিং মাচ | আই অ্যাম অ্যান আর্কিটেক্ট | এখন আপাতত সিঙ্গল | দিনগুলো কেটে যায় মেশিনের মতো – গুচ্ছের প্রেসেনটেশনস্, অফিসের অন্যান্য কাজ, মাঝে মাঝে ট্যুর – এই তো! হাউ অ্যাবাউট ইউ?"

প্রীতীশ– "আমি ছবি আঁকি |"

অতসী– "হ্যাঁ, সে তো বুঝলাম; কিন্তু হোয়াট্ ডু ইউ ডু? আই মিন, তোমার প্রফেশন?"

প্রীতীশ– "হ্যাঁ, সেটাই তো বললাম... আমি একজন আর্টিস্ট... তবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিনি এখনো | চেষ্টা করছি, কিন্তু এ তো আর আমার হাতে নেই |"

অতসী– "বাই দ্য ওয়ে... রাখতে হবে এখন | কাল আর্লি মর্নিং ফ্লাইট ধরতে হবে; অফিসেরই কাজে যেতে হবে – বললাম না মাঝে মাঝে যেতে হয়?"

প্রীতীশ– "ও কে | বাই ফর নাউ, হ্যাভ আ সেফ জার্নি |"

ঘরের আলো নিভে গেল | কম্পিউটারও চলে গেল স্লিপ মোডে, আর অতসী চলে গেল শুতে | কিন্তু ঘুম এল না |

ট্যুর থেকে ফিরে আসামাত্র আবার সেই নিয়ম – কফির ধোঁয়া, সজাগ কমপিউটার স্ক্রীন আর আবার সেই লেখালেখির খেলা – প্রতি রাতের গল্প |

প্রীতীশ– "ট্যুর কেমন হ'ল?"

অতসী– "হয়ে গেল; সো, লেট মি আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন |"

প্রীতীশ– "নিশ্চয়ই, বলো |"

অতসী– "আমরা তো বেশ কিছুদিন ধরেই এই চ্যাট্ করছি; কিন্তু এখনও কেউ কাউকে দেখিনি, সো হাউ ডু ইউ লুক?"

তোমার তো কোন প্রোফাইল পিকচার নেই, শুধু আকাশ দেখি ওখানে | তুমি মনে হয় নীল আকাশ ভালবাসো, তাই না?"

প্রীতীশ– "অবশ্যই! আকাশের কী গভীরতা, কী অদ্ভুত সীমাহীনতা, তাকে ভাল না বেসে পারা যায়? কিন্তু আমারও একই প্রশ্ন – তোমারও তো কোন প্রোফাইল পিকচার নেই; শুধু পাখীর ছবিই তো দেখি, তুমি পাখী এত ভালবাসো?"

অতসী– "অবশ্যই! কী অদ্ভুত তার স্বাধীনতা, ইচ্ছে হলে সে কেমন উড়ে যেতে পারে যেখানে সেখানে | কিন্তু প্রীতীশ, একটা কাজ তুমি করতে পারো – হোয়াই ডোন্ট ইউ ইম্যাজিন মি? আর আমার একটা ছবি আঁকো না? তুমি তো আর্টিস্ট!"

এবার ওদিক থেকে একটা স্মাইলি ফেস ভেসে এল অন্ধকারে | তারপর এল আরও দুটো লাইন, "তুমিও আমার ছবি এঁকে পাঠাও না, তোমার মতো করে... তুমি তো আর্কিটেক্ট, ডিজাইন তো করোই!"

ঘরের আলো নিভে গেল | আজকের মতো এখানেই ইতি |

চিরকালের নিয়মে রাত কেটে ভোর হ'ল | দিনের ব্যস্ততা এল, গেল, সন্ধ্যে নামল... তারপর সেই রাত, কফি, ধোঁয়া, আর নিঃশব্দে দুটি প্রাণের কথোপকথন |

আজ কম্পিউটার খুলতেই অতসীর নজরে পড়ল প্রীতীশ সত্যি সত্যিই নিজের কল্পনাতে গড়ে তুলেছে অতসীকে | লম্বাটে নিটোল মুখে মানানসই করে কালো চুলের গোছ ঘাড়ের উপর তুলে একটা এলোমেলো খোঁপা | হালকা অফ্ হোয়াইট শাড়ীতে জড়ানো লতানে শরীর, গায়ে কালো হালকা একটা শাল আর চটুল দুটি চোখ |

অতসী অবাক হয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে দেখল ছবির মানুষের সাথে তার অনেকটাই মিল | তারপর ছোট করে একটা উত্তর দিল, "জাস্ট লাভলি |"

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে উত্তর এল, "আমারটা?"

অতসী– "আরে, তুমি হলে আর্টিস্ট মানুষ, তুমি পারো | আমি তো ঠিক তোমার মতো নই | আমি তোমার মতো পারি না |"

এবার ওদিক থেকে একটা স্যাড ফেস ইমোজি ভেসে এল; আর তার সাথে একটা লাইন – "আমার ছবি তুমি আঁকতে সময়

পাওনি তাই তো? ব্যস্ত মানুষ তুমি!"

অতসী– "তা ঠিক নয়। এঁকেছি, যা মনে হয়েছে... কিন্তু পুরোটা পারছি না; হাফ হয়েছে। ঠিক আছে চাইলে এটাই সেন্ড করে দিচ্ছি।"

প্রীতিশের স্ক্রীনে ভেসে উঠল অতসীর আঁকা প্রীতিশের ছবি। অদ্ভুত! লাল শার্টপরা, পিছন ফিরে বসা, মাথাতে একরাশ অবাধ্য চুল, হ্যাঁ অনেকটা মিল! মনে মনে হাসি পেল, অতসী আর মুখ চোখ আঁকার ঝামেলা নেয়নি। তাই বুদ্ধি করে পেছন ফেরা ছবি, কোমরের নিম্নাংশ ছবিতে ধরার আর সময়ই পায়নি।

অতসী– "কেমন লাগল? কই বললে না তো?"

প্রীতীশ– "তা... প্রায় আমারই মতো।"

ঘড়িতে বারোটা বাজতে যায়। প্রীতীশের তেমন একটা তাড়া না থাকলেও অতসীর থাকে। কাজে অনেক প্রেসার থাকে। আলো নিভে যায়।

পরের রাত। একই ঘটনা। এমনি করে চলতে থাকে অতসী আর প্রীতীশের সাইবার রোমান্স।

মাস দু'এক বাদে হঠাৎ অতসী বলে বসল, "উই আর চ্যাটিং ফর সাম টাইম্; লেটস্ মিট্।"

ওদিক থেকে প্রীতীশ লিখল, "ঠিক আছে।"

অতসী বলল, "এই শনিবারই, এসো তুমি।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল না, যেমনটি আসে। একটু বাদে এল, "লেডিস ফার্স্ট।"

অতসী একবাক্যে মেনে নিল। ট্র্যাভল করা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে।

শনিবার এল। অ্যাড্রেস বুঝে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অতসী। সারাটা দিন ট্র্যাভল করতেই কেটে গেল। অবশেষে এসে দাঁড়াল একটি পুরনো গলির সামনে।

হ্যাঁ, ওই তো! ঠিক রাস্তার গা ঘেঁষা উঁচু বাড়িটা, একটু পুরনো স্টাইলের। তার দোতলা হ'ল তার গন্তব্য স্থান। কোনও দ্বিধা না করে সে উঠে এল দোতলায়। মনে হ'ল ঢোকার দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখা। এমনি করে হুট্ করে ঢোকাটা কি ঠিক হবে? এই ভেবে অতসী দরজাতে একটু আলতো করে টোকা দিল। সাথে সাথে ঘরের ভেতর থেকে এল এক গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ, "ওয়েলকাম্! এসো, ভিতরে ঢুকে এসো। আমি এখানেই আছি।"

অতসী বাইরে জুতো খুলে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে এল। ছিমছাম রুচিসম্মতভাবে স্বল্প ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ছোট্ট বসার ঘর, এল্ সেপ হয়ে ঘুরে গেছে বাঁদিকে। কিন্তু সামনে সে কাউকে দেখতে পেল না। ঘরের কোণে চোখে পড়ল একটি লম্বাটে পুরনো আয়না; তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। তবে কেবল শরীরের উপরভাগ। লাল শার্ট, মাথার চুল অনেকটা তারই কল্পনার ছবির মতো।

আবার সে বলে উঠল, "এসো এদিকটাতে, আমি এইখানে। অতসী ওদিকে গেল। একী! হুইল চেয়ারে পিছন ফিরে বসে আছে প্রীতীশ। এবার সে ঘুরে তাকাল। মুখে ক্লান্তির ছাপ। তার দুটি চোখ যেন কথা বলে। কলেজে পড়াকালীন এই দুর্ঘটনা, অ্যাক্সিডেন্টে দুটো পায়ের মিড থাই পর্যন্ত অ্যাম্প্যুটেশন হয়। প্রীতীশ ধীরে ধীরে বলল, "আমি তো তোমাকে বলেই ছিলাম যে আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিনি।"

অতসী খানিকক্ষণ চুপ করে প্রীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, "আর তাই লেডিস ফার্স্ট?"

প্রীতীশ অতসীর দিকে তাকিয়ে আছে। অতসীর যে ছবি সে এঁকেছিল, যেন তারই সাথে তাল মিলিয়ে সেজেছে অতসী। শুধু গায়ে তার হালকা মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ। নিস্তব্ধ ঘরে বন্ধ হাওয়া যেন গেয়ে উঠল, "আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা..." এবার প্রীতীশ অতসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সো? হোয়াট নেক্সট্?"

অতসী প্রীতীশের চোখে চোখ রেখে উচ্চারণ করল "আই ডু!" ধীরে ধীরে তার কালো শালটা গা থেকে সরিয়ে ফেলল।

একী! তার বাঁ হাতে আর বুকের উপরের দিকের বেশ খানিকটা অংশে জ্বলে যাওয়ার গভীর দাগ। তাহলে এটাই কি তার সেই ভয়ংকর অতীত? আর ছেড়ে আসা জীবনের দাগ? অ্যাসিড বার্ন? অনেকবার অতসী বলতে চেয়েছিল তার এই ফেলে আসা ইতিহাস। কিন্তু প্রীতীশ অতীতকে ভীষণ ভয় পায়। সে কোনদিন ঠিক করে শুনতে চায়নি। আর আজ না চাইতেও সেই ভয়ংকর অতীত তার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রীতীশ– "সো, মিস অতসী বোস? হোয়াট আ সারপ্রাইজ!"

অতসী গায়ের শালটা জড়াবার আর প্রয়োজন বোধ করল না। ধীরে ধীরে দরজার দিকে পা বাড়াল। থমথমে ঘরের ঝাপসা আলোর মধ্যে চোখে পড়ল দেওয়ালে ঝুলছে অপূর্ব সব ছবি।

প্রীতীশের নিজের হাতে আঁকা সেসব ছবি | অতসী বোস আর একবার উত্তাল জীবন সমুদ্রের পাড়ে এসে থমকে দাঁড়াল | হোয়াট নেক্সট্? হঠাৎ যেন সেই সীমাহীন অতল সমুদ্র পেরিয়ে, সবকিছু ছাপিয়ে অতসীর কানে এল প্রীতীশের সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, "আই ডু!"

রাতের অন্ধকারে যে গল্প লেখা শুরু হয়েছিল, আজ তার প্রথম পর্বের সমাপ্তি |

বছর দুই বাদে অতসী এবং প্রীতীশের ঘরে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম হয় | তার নাম রাখা হয় 'উত্তরণ'; রাত থেকে উত্তরণ |

শুরু হ'ল পর্ব ২...!

হলুদ ফিতে

চিত্ত ঘোষ

বহুযুগ আগে, মানে যুবাকালের প্রথম দিকে, রীডার্স ডাইজেস্টে একটা গল্প পড়েছিলাম, লেখা ছিল সত্য ঘটনা অবলম্বনে | সেই কাহিনী ছিল বর্ণে গন্ধে গীতিতে প্রায় রূপকথার মতো, রোমান হলিডে সিনেমা, মিলস অ্যান্ড বুন ও সিন্ডারেলার গল্প যেমন হয় সেরকম ফুরফুরে 'ফিল গুড' জাগানিয়া | আমাদের ধুলো মাটির জীবনেও এমনটা যে ঘটে না তা নয়, তবে তা বিরল ব্যতিক্রম | কী করে গল্পটি পুরনো স্মৃতির সিন্দুক থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল, বলি |

কয়েকদিন আগে আমার নিকট পরিচিত এক দম্পতির কন্যার প্রাক-বিবাহ রিসেপশন টলি ক্লাবে | নেমতন্ন করলেন | এই রেওয়াজ আমাদের সময় ছিল না | ভুল লিখলাম | ছিল, কিন্তু কেউকেটা ক্লাব কালচার উচ্চবিত্তদের মধ্যে, যাদের ভুবনে আমার মতো হাভাতেদের কোন জায়গা ছিল না | আজকাল দেখছি তাদের কারো কারো কাছ থেকে নেমতন্ন আসে | ভারতের আধসেদ্ধ গণতন্ত্রই জানে কী গুণে আমি তাদের জাতে উঠে এলাম | দু'চারটে জুতসই অছিলা, অজুহাত খাড়া করে এড়িয়ে যাবার মতলব ভেঁজেও শেষ রক্ষা হ'ল না | আজকাল আর এসব জায়গায় যেতে সাড়া দেয় না একা মন | নেমতন্ন কত্তা ও কর্ত্রী বার বার করে বললেন, লোভ দেখালেন এই বলে যে অমুক আসছেন, তমুক আসছেন | তোমার খোঁজ নিয়েছেন | তাদের নাম শুনে নেতি ভাবটা কেটে গেল | এইসব অনুষ্ঠানেই দেখা হয়ে যায় দু'চারজন পরিচিত বা যোগাযোগহীন কোনও দূরের আত্মীয়দের সাথে | সুতরাং প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবি গলিয়ে চলে গেলাম একটা অটো নিয়ে | অনুষ্ঠানের থীম বেশ খাসা | পুরুত, বরযাত্রী, দেখভাল – এসবের বালাই নেই, মান্ধাতা আমলের আচার বিচার নেই | সাজাগোজা লোকজন | পারফিউমের মৃদু সৌরভ, খাবারের ঘ্রাণ, হালকা মিউজিক, খবরাখবর, প্রীতি বিনিময় – বেশ লাগছিল |

এই পার্টিতে বিয়ের জন্য মানত করা বিসমিল্লা খান বাজেনি | ক্লাসিক্যাল বা রবীন্দ্রসঙ্গীতও নয় | বাজছিল পুরনো ইংরেজি হিট গান সব | দু'একটা হিন্দি ওল্ডিজ, বিটলস, এলভিস, সামার হলিডে, টাকিলা, বাচ্চা হাতির হাঁটা (বেবি এলিফ্যান্ট ওয়াক),

লিপস্টিক অন ইয়োর কলার | সেপ্টেম্বর আইয়া পরসে; অর্থাৎ কাম সেপ্টেম্বর, সামার ওয়াইন, এই জুড, কেলো করিস না, সুইট ক্যারোলাইন, ডিলাইলা, সলিল, পঞ্চম উইকেট – এইসব; নস্টালজিয়ায় ঈষৎ লস্ট হয়ে যাচ্ছিলাম | হঠাৎ কানে আসে 'টাই এ ইয়েলো রিবন'| বহুদিন পর শুনলাম, মনে পড়ে গেল রিডার্স ডাইজেস্টের গল্পটা – এই গানটার সাথে জড়ানো |

আমেরিকার মিড-ওয়েস্টে চলছে এক গ্রে-হাউন্ড বাস (এ দেশের সবচাইতে বড় পাবলিক বাস কম্পানি)| বাসে জনা বিশেক স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী | যাচ্ছে সামার ক্যাম্পে | ওরা ছাড়া মাত্র একজন | বড়, বেঢপ এক ওভারকোট গায়ে বছর চল্লিশের একজন লোক; নীল চোখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিষণ্ন উদাস চাউনি পলকহীন চোখে | মাথায় বিবর্ণ গল্ফ ক্যাপ |

এই বয়সে মেয়েদের কৌতূহল বড্ড বেশি | নিজেদের মধ্যে কথা শুরু হয়ে গেল লোকটা কে হতে পারে! কেউ বলে, "দেখ, যখন ট্রেঞ্চকোট পরা, তখন নিশ্চয়ই ভিয়েৎনাম ফৌজী | ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে |" কেউ বলে, "না, বোধহয় অ্যালাস্কার অয়েল রিগে কাজ করে |" আরেকজন কয়, "হাতদুটো দেখ, কেমন এবড়ো খেবড়ো – আমার মনে হয় ও স্যান্ডিয়েগোর তামার খনিতে কাজ করে |"

ফিসফাস আলোচনা চলতেই থাকে | তারপর একটি মেয়ে সাহস করে লোকটির কাছে গিয়ে বলে, "যদি কিছু না মনে করেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি? সারা বাসে আমাদের মাঝে আপনি একলা পুরুষ, কোথায় যাচ্ছেন?"

লোকটি একটু চুপ থেকে বলে, "আমি নিজেই জানি না | মাঝ-রাস্তায় নেমে যেতে পারি | আবার শেষ অবধিও যেতে পারি |"

মেয়েদের কৌতূহল আরও বাড়ে | এবার সোজা প্রশ্ন আসে – "আপনি কী করেন? ফৌজী?"

লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে; কিছু ভাবছে যেন |

তারপর শান্তস্বরে শুরু করে সলিলকি, মনোলগ, জবানবন্দির মতো করে | আরও মেয়েরা তখন চারপাশে দাঁড়িয়ে গেছে |

"আমি আট বছর পর আজ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি | মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম | সেখানে একজন মারা যায় | আমি মারিনি, শুধু পিছন থেকে তাকে পেঁচিয়ে ধরেছিলাম | কিন্তু বিচারে আমার জেল হয়, তখন আমাদের প্রথম সন্তান মাত্র মাস চারেকের | আমার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী, ছেলেবেলার সুইট-হার্টকে বলে গিয়েছিলাম আমার সাথে কোনো সম্পর্ক না রাখতে | জেলে গিয়ে দেখা করা নয় | ফোন নয় | চিঠি নয় | আমিও কোনো যোগাযোগ রাখব না | সে যন্ত্রণা পেয়েছিল, খুব কাঁদছিল | সান্ত্বনা দিতে বুঝিয়ে বলেছিলাম – আট বছর অনেক লম্বা সময় | আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করে কেন তোমার জীবন নষ্ট করবে | তুমি এত সুন্দর, তোমার বয়স কম | তুমি যদি চাও, আবার বিয়ে করে নাও | আমি কিছু মনে করব না |"

লোকটি আবার চুপ করে যায় কিছুক্ষণের জন্য | জল খায় | মেয়েদের কৌতূহল তখন তুঙ্গে |

লোকটি আবার শুরু করে – "বলেছিলাম, যদি আট বছর পরেও আমাকে তুমি মনে রাখো, যদি অপেক্ষা করো আমার জন্য, তাহলে জানিও | চিঠিতে নয়, কথাতেও নয়; একটা হলুদ ফিতে বেঁধে রেখো শুধু | হাইওয়ে থেকে আমাদের গ্রাম হোপসভিল যাবার ছোট পথের মোড়ে আছে এক প্রাচীন ওকগাছ | সেই গাছে একটা হলুদ ফিতে বেঁধে রেখো | সেই ফিতে দেখতে পেলে আমি বাস থেকে নেমে যাব | ফিরে আসব তোমার কাছে, আমাদের সন্তানের কাছে |"

একটু বিরতি | মেয়েদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে দ্রুত পিছলে যাওয়া দৃশ্যপটের দিকে চোখ রাখে | কিছু দেখছিল বলে ওদের মনে হ'ল না | সেদিকে তাকিয়েই শেষ করল তার শেষের কথাগুলো – "না হলে চলে যাব, হারিয়ে যাব পাকাপাকিভাবে |"

মেয়েদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে | উত্তেজনা গ্রাস করছে | দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে হোপসভিল আর কতদূর |

- "আর ন'মাইল" জানায় ড্রাইভার |

মেয়েরা জানলার সাথে সেঁটে যায় মাইল ফলকের খোঁজে | ওদের সবার রুদ্ধশ্বাস – নাড়ির গতি দ্রুত, হৃদস্পন্দন, উৎকণ্ঠা, সাসপেন্স – সব মিলিয়ে এক সামুদ্রিক তরঙ্গ জমাট বেঁধেছে | গল্পটা পড়তে পড়তে তা ফিজিকালি অনুভব করেছিলাম |

আট – সাত – ছয়...

সবাই শক্ত করে একে অপরের হাত ধরে আছে | এসি বাস, নয়তো জানলা দিয়ে অনেকেই বাইরে ছিটকে যেত | অস্থির ওরা, ড্রাইভার কেন এত আস্তে চালায়?

পাঁচ – চার – তিন – দুই – এক...

দূরে কি কিছু দেখা যাচ্ছে ? হলুদ রঙের আভাস?

আরও কাছে এলে দেখা গেল হোপসভিলের পথের মোড়ের সেই ওক গাছ। পুরো গাছটা হলদে। কেন?

বাস থামে সেখানে। ওক গাছের প্রতিটি ডাল থেকে ঝুলছে অসংখ্য হলুদ ফিতের শেকল। গাছের সামনে দাঁড়ানো প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষ মহিলা শিশু। তাদের হাতে এক বিশাল হলুদ রঙের ব্যানার, লেখা – "ওয়েলকাম হোম, মাই লাভ।" সেই ব্যানারের সামনে এক সুন্দরী যুবতী – হলুদ পোশাকে। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে বছর আটেকের ফুটফুটে এক বালিকা। তারও হালকা হলুদ পরীদের মতো ফ্রক, তাতে রূপোলী চাঁদের চুমকি।

লোকটি উঠে দাঁড়ায়। চোখ চিক চিক করছে ধরে থাকা জলে। একবার ঘুরে বাসের মেয়েদের দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকায়। মুখে স্বর্গীয় হাসি, যা কেবল হারানো ভালবাসা ফিরে পেলে মানুষ হাসতে পারে। হাত নাড়ায়, তারপর নেমে যায় ধীর পায়ে।

সব মেয়েদের চোখ ভেজা। অনেকেই কাঁদছে ঝরঝর করে। পর মুহূর্তে বাস ফেটে পড়ে তুমুল হাততালির শব্দে। মেয়েরা জড়িয়ে ধরে একে অপরকে। এখানেই গল্পটির শেষ, অন্য গল্প শুরুর জন্য।

যারা গানটি জানে তাদের কেউ বলে এটা সত্যি। পন্ডিতরা উড়িয়ে দেয়, বলে বাজে কথা। এরকম হয় নাকি! সত্যি হোক মিথ্যে হোক, গল্পটা আজ আমেরিকার লোককথা, ফোকলোরের অঙ্গ।

কেন জানি না আমার নিজের বিশ্বাস এটা সত্যি। মনে হয় আমাদের সবার জন্যই বাঁধা থাকে এমনতর হলুদ ফিতে কোথাও না কোথাও! হাওয়ায় দোলে! Dancing in the wind! সে ফিতে খুঁজে পায় কেউ কেউ, আবার অনেকের জন্য হারিয়েও যায়। কোনও ঝড়ে উড়ে যায় অন্য কোন ঠিকানায়।

রাত দূষণে আক্রান্ত টলি ক্লাবের আকাশ আমার মাথার ওপর নেমে এসে খসখসে গলায় মনে করিয়ে দিল, অনেক হয়েছে এবার থামো। আমি গুটি গুটি পায়ে বুফের দিকে এগোলাম। মনে পড়ল 'টাই এ ইয়েলো রিবন' ৪৫ আর পি এমের এস পি রেকর্ডটি এখনও আমার জিম্মায় অক্ষত আছে।

হিন্দি লঘুকথার বাংলা অনুবাদ

ফাটল

কুনয়র প্রেমিল (জব্বলপুর)
অনুবাদ: বেবী কারফরমা

এক মা তার সন্তানকে রঙ বেরঙের পেনসিল এনে দিল। খোকাটিও তাড়াতাড়ি রঙ করতে বসে গেল। সর্বপ্রথম সে একটা সুন্দর নদী আঁকল, নদীর দু'ধারে সবুজ গাছপালা, একটা গাছপালাভরা সবুজ পাহাড় আর পাহাড়ের পিছনে সূর্য উঠছে। তার মাঝে সুন্দর একখানা ঘরও আঁকল। খোকা আনন্দে নাচতে লাগল। সে হাততালি দিয়ে মায়ের কাছে এসে বলল, "মা দেখো, কত সুন্দর সিনারি বানিয়েছি।"

মা দেখে চমকে গেল, আর প্রশংসা করে ছেলের মনোবল বাড়িয়ে দিল। চিত্রকলা জীবন্ত হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পর খোকা ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, "মা, একটা ভুল হয়ে গেছে। এখানে দাদু-ঠাকুমার থাকার জন্য জায়গা হচ্ছে না।"

মায়ের আওয়াজ ভেসে এল, "বাইরে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে দাও, দাদু-ঠাকুমা ওখানেই থাকবে।"

একথা শুনে বাচ্চা একদম হতভম্ব! ওর সিনারিটা সঙ্গে সঙ্গে বেরঙ হয়ে গেল। তার চিত্রকলায় কে যেন কালি মাখিয়ে দিল। তার আঁকা বাড়িটায় একটা ফাটল ধরে গেল।

অবিচার

বিজয় সিংহ চৌহান (ইন্দোর)
অনুবাদ: বেবী কারফরমা

- "ঠ্যালা তোমার?"

- "হ্যাঁ হুজুর।"

প্রমাণ আর জবানবন্দীর নিরিখে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হ'ল।

- "সকলের ব্যবহার করা রাস্তা দখল করা অপরাধ। তুমি এই অপরাধ করেছ, তাই তোমায় শাস্তি দেওয়া হ'ল।"

সাহেবের কথার সাথে কলমও যখন দৌড়াচ্ছিল তখন সুখীরাম গামছা দিয়ে অঝোরে বয়ে যাওয়া ঘাম মুছতে মুছতে বলল –

"সাহেব, কী করব! চারদিন ধরে গর্ত খোঁড়া আছে, কিছু জন্তু-জানোয়ার ওতে পড়ে রক্তাক্ত হয়েছে। যাতে কোনো মানুষের মৃত্যু না হয় তার জন্য দোকান বন্ধ রেখে গর্তের মাঝে ঠ্যালা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, আর দুদিকে লাল গামছা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম, কেউ যেন গর্তে পড়ে না যায়।"

অতীতের জানালা

অঞ্জু খারবান্দা (দিল্লী)
অনুবাদ: বেবী কারফরমা

হোসিয়ারপুরে একটা বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণ ছিল। জম্মু তাওয়াই ট্রেনে যাওয়া ঠিক হ'ল। হালকা ঠাণ্ডা পড়েছে তাই এসি-তে না গিয়ে জেনারেল কমপার্টমেন্টে যাওয়া ঠিক করলাম। জেনারেলেও মজা আছে। যদিও বউ বাচ্চা প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, পরে তারাও জেনারেলে যেতে রাজি হ'ল। দিল্লী থেকে মোটামুটি আট ঘন্টার সফর। সীট রিজার্ভ ছিল তাই খুব একটা অসুবিধা হ'ল না। বাচ্চারা উঠেই জানালার ধারে গিয়ে বসে পড়ল। সমস্ত লাগেজ যথাযথ জায়গায় রেখে আমরা স্বামীস্ত্রী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

- "দিদি! জম্মুর শাল নেবেন? খুব সুন্দর।" নানা রঙের শালভর্তি একটা ভারী বোঁচকা নিয়ে এক শ্যামবর্ণ, মৃগ-নয়নী অল্প বয়সী বউ হাঁকতে লাগল।

- "কত করে?"

- "আড়াই'শ, দিদি।"

- "এত দাম?"

- "বেশি নিলে, দাম কম করে দেব, দিদি।"

- "আমি কি দোকান খুলব নাকি?"

- "নিয়ে নাও, তোমার দুই দিদি আর বৌদিদের জন্য।" আমি স্ত্রীকে বলতেই সে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল, আর ইশারা করে চুপ করতে বলল।

- "আচ্ছা, পাঁচটা নেব, কত দেব?"

- "দু'শ টাকা করে এক পিস্ পড়বে।"

- "না, এক'শ করে দিতে পারব।"

- "দিদি, এক'শ খুবই কম হয়ে যাবে।" বলতে বলতে ওর গলা ভিজে গেল আর চোখে জল চলে এল।
- "ঠিক আছে, এক একটা দেড়'শ করে দাও।"
- "ঠিক আছে দিদি, তোমার যে রং পছন্দ সেটা নিয়ে নাও।" সে আমার স্ত্রীর কাছে বোঁচকা খুলে ছড়িয়ে দিল।

আমার বউ তার পছন্দমতো শাল নিয়ে আমায় টাকা দেবার জন্য ইশারা করল। আমি ৭৫০ টাকা বের করে দিয়ে দিলাম।

শাল বিক্রেতা বউটি চলে যাবার পর থেকে বাকি রাস্তা আমার বউ একই কথা বলতে থাকল, "ও একবার দেড়'শ বলতেই রাজি হয়ে গেল, একটু দরাদরি করলে শালের দাম আরও কম হতো।" যাত্রা শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই একই কথা বলতে থাকল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম আমার বাবাও ট্রেনে হকারি করে যখন বাড়ি ফিরত, তখন তার চোখের চারপাশে যেভাবে ঘাম ঝরে পড়ত, আজ শাল বিক্রেতা বউটির চোখেও তাই দেখলাম।

মানুষ ও আমি

বীরেশ্বর মিত্র

সে অনেকদিন আগেকার কথা। সালটা ঠিক মনে নেই। হয়তো নব্বই দশকের কোন সময়।

ভোর নাগাদ আমাদের বোয়িং 737 ছাড়ল জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহর থেকে। গিয়েছিলাম সেখানকার শিল্পমেলা থেকে আমাদের কম্পানির জন্য একটা খুব দামী ও দুষ্প্রাপ্য মেশিন কিনতে। আমার ঊর্ধ্বতন কর্তার বিশ্বাস অনুযায়ী আমি ছাড়া আর কেউ নাকি সে কাজ পারবে না। সে যাই হোক...

তারপর ওই যা হয় আরকি – টানা তিন দিনব্যাপী দৌড়ঝাঁপ শেষে মেশিন পছন্দ করে তার বায়নার টাকাকড়ি জমা দিয়ে একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সাত সকালে প্লেন ধরা। প্লেনে কোনমতে এক কাপ কফি শেষ করতে না করতেই প্লেন নামল ফ্র্যাঙ্কফুর্টে। সেখানে প্লেন বদল করে এবারে রওনা দিলাম জাম্বো জেটে। তারপর এক্কেবারে যাকে বলে টেনে ঘুম।

প্লেন মুম্বাই পৌঁছাল, রাত তখন প্রায় এগারোটা। গাদাগুচ্ছের যত সব ফর্মালিটি সেরে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোতেই দেখি আমাদের মুম্বাই অফিসের ম্যানেজার, কুলকার্নি একগাল হাসি নিয়ে হাত নাড়ছে। বাঁচলাম। এত রাতে ট্যাক্সি ধরে হোটেলে যাওয়া বড্ড ঝামেলা!

কুলকার্নির গাড়ি সঙ্গেই ছিল। নিজেই চালিয়ে নিয়ে গেল গ্র্যান্ড মারাঠা হোটেলে। ঘর বুক করা ছিল। হোটেলের ঘরে ঢুকে দেখি রাত তখন একটা। শরীর আর চলছে না। কিন্তু এখনো কাজ একটু বাকি আছে। কুলকার্নির দেওয়া ট্রেনের টিকিটটা বার করে দেখি আমার পুনা যাওয়ার ট্রেন ভিটি থেকে ছাড়বে সকাল ছ'টায়, পুনা পৌঁছাবে সাড়ে দশটায়।

মেরেছে! আমাকে অন্তত পক্ষে সাড়ে চারটের মধ্যে হোটেল ছাড়তে হবে। ট্রেনের টিকিটটা জামার বুক পকেটে যত্ন করে ঢুকিয়ে রেখে রিসেপশনে ফোন করে ভোর চারটের একটা অ্যালার্ম সেট করালাম। আর ভোর সাড়ে চারটের জন্য একটা ট্যাক্সি রিকোয়েস্ট। বাকি রাতটা মোটামুটি আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে গেল। সবে একটু তন্দ্রা এসেছে, ঠিক সেই সময় বালিশের পাশের ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল। ওপাশ থেকে একটি যান্ত্রিক গলা আমাকে বলল, 'ইওর মর্নিং অ্যালার্ম

স্যর'। কৃতার্থ করেছ। থ্যাংক ইউ।

তাড়াতাড়ি উঠে চোখে মুখে একটু জলের ঝাপটা দিয়ে লাগেজগুলো একবার দেখে নিলাম। লাগেজ আর কি, ওই একটা বড় ভিআইপি সুটকেস, আমার বসের দেওয়া একটা Samsonite ব্রিফকেসভর্তি কোটেশন, ক্যাটালগ, মেশিনের ড্রইং ইত্যাদি এবং আমার প্রাণতুল্য মূল্যবান একটা কালো চামড়ার পাসপোর্ট কেসের মধ্যে আমার পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট, বোর্ডিং কার্ড, হোটেল, রেস্টুরেন্টের বিল, ট্যাক্সির বিল, প্রায় পাঁচ হাজার ডলার আর আট হাজার ভারতীয় মুদ্রা। এটা যদি হারিয়ে ফেলি তাহলে নির্ঘাৎ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে।

যাইহোক, সেসব লটবহর নিয়ে লিফটে করে নীচে নেমেই দেখি বাইরে ট্যাক্সি বিরাজমান। হোটেলের বিল মিটিয়ে যখন হলুদ কালো ট্যাক্সিতে উঠলাম তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় পৌনে পাঁচটা। পূর্ব ভারতের তুলনায় মুম্বাইয়ের সূর্যোদয় প্রায় ঘন্টা দেড়েক দেরিতে হয়। কাজেই পৌনে পাঁচটা মানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হেডলাইট জ্বালিয়ে ট্যাক্সি ছুটল মাহিম, দাদার, পারেল হয়ে ভিটি। ট্যাক্সি ড্রাইভারটি এক লাল দাড়ি, লাল চুল, সাদা রঙের গোল টুপিপরা ভুরু কোঁচকানো লোক। পরনে খাকি ইউনিফর্ম।

বললাম, "ভাইসাব একটু জোরে চালাইয়ে। হামকো ট্রেন পাকড় না হ্যায়।"

ড্রাইভারের ভুরুজোড়া আর একটু কুঁচকে গেল। তবে গাড়ির গতি বাড়ল। ভিটি যখন পৌঁছালাম তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমাদের ট্যাক্সিটা সেখানে একমাত্র গাড়ি। বাকি সব শুনশান। ট্রেন ছাড়তে তখন আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি। আমার বুক তো টেনশনে ধড়াস ধড়াস করছে। গাড়ি থেকে একরকম লাফ দিয়ে নামলাম। লাগেজ বুট খুলে ভিআইপি সুটকেসটা বার করে মাটিতে নামিয়ে ক'পা এগিয়ে উঁকি মেরে ট্যাক্সির মিটারটা দেখলাম। দেখি আড়াই'শ টাকা। বাপরে! এ তো দিনে ডাকাতি! অবাক হয়ে চালকের দিকে তাকালাম। ড্রাইভার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "সাত'শও দিজিয়ে।"

- "কেন দেব?"

- "নাইট চার্জ, ডবল রেট, উপরসে এমেরজেন্সি রেট দোশও।"

একে তো মিটারে সন্দেহজনক গোলমাল, তার ওপরে নাইট চার্জ! তার ওপর আরো দু'শ টাকা? রাগে আমার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে উঠল। মানিব্যাগ থেকে গুনে গুনে পাঁচটা এক'শ টাকার নোট বার করে ট্যাক্সির বনেটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ভিআইপিটা একহাতে, আর Samsonite ব্রিফকেসটা অন্য হাতে উঠিয়ে একটু রাগতভাবেই বললাম, "লেনা হ্যায় তো লো, নেহিতো ফেক দো।"

ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্যক্রমে আমার এসি চেয়ারকার কামরাটা একদম সামনে। মনটা আবার ভাল হয়ে গেল। কামরায় উঠতে যাব হঠাৎ খেয়াল পড়ল সঙ্গে আমার কালো পাসপোর্ট কেসটা নেই। সর্বনাশ! এই তো ছিল, কোথায় গেল! সেই ব্যাগটার মধ্যেই যে আমার পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট, বোর্ডিং কার্ড, পাঁচ হাজার ডলার, আট হাজার ভারতীয় মুদ্রা এবং আরো কত কী ছিল! এটি হারালে আমি শেষ। ফিনিশ।

মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। এখন কোথায় যাই? কী করি? ট্রেনে উঠব, কি উঠব না। সে ব্যাগটা এখন কোথায় খুঁজতে যাব? হতে পারে হয়তো ট্যাক্সি থেকে নেমে দৌড়তে গিয়ে বগলের তলা থেকে পড়ে গেছে। হয়তো বা সেই বদমাশ লোকটার ট্যাক্সিতেই পড়ে আছে। ভগবান তুমি কোথায়? কালীবাড়িতে পুজো দেব মা। শুধু ব্যাগটা পাইয়ে দাও।

ট্রেন ছাড়তে দশ মিনিট বাকি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি; দেখি এক ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করতে বললেন উনিও পুনা যাবেন। হবি তো হ আমারই কামরায়।

আমার সব কথা ওঁকে খুলে বলে জোড়হাতে অনুরোধ করলাম আমার ভিআইপিটার ওপর একটু নজর রাখতে। উনি পুরোপুরি হ্যাঁ বলার আগেই Samsonite ব্রিফকেসটা এক হাতে নিয়ে আমি ছুট। একমাত্র আশা যদি স্টেশনে ঢোকার পথে মাটিতে এখনো পড়ে থাকে। নতুবা যদি সেই ট্যাক্সিওলাকে খুঁজে পাই। বলাই বাহুল্য, পথে কোথাও সেটা পেলাম না।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দেখি তখন পুরোপুরি আলো ফুটে গেছে। চারিদিকে লোকের ভিড়। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা সব স্টেশনে ঢুকছে। স্ট্যান্ডে অন্তত দেড়'শটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।

এদিক ওদিক দেখছি, কিন্তু কোথায় আমার সেই ট্যাক্সি? এত ট্যাক্সির মেলা! এখানে কোথায় পাব তারে? আবার আমার মাথায় হাত। এই খড়ের গাদায় কোথায় আমি ছুঁচ খুঁজতে যাব? ধরণী দ্বিধা হও। হঠাৎ দেখি কে একজন আমাকে দূর থেকে হাতছানি

দিয়ে ডাকছে। এদিক ওদিক দেখলাম। আমাকেই ডাকছে, না অন্য কাউকে – নাঃ, ওইত্তো সেই লাল দাড়ি, লাল চুল, সাদা টুপি। আমার দিকেই তাকিয়ে জোরে জোরে হাত নাড়ছে। কাছে যেতেই আমার কালো পাসপোর্ট কেসটা বাড়িয়ে দিল। হাতে নিয়ে আগে চেনটা খুলে দেখলাম। সব ঠিকঠাক আছে। ভগবান তুমি আছ! মানিব্যাগ বার করে পাঁচ'শ টাকা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

- "নেহি সাব।"
- "কিঁও?"
- "পইসা নেহি চাহিয়ে।"
- "কিঁও? বচ্চালোগো কো মিঠাই খিলাইয়ে।"
- "নেহি সাব।"
- "কিন্তু, কিঁও নেহি? অভি অভি হামরা সাথ পাইসাকে লিয়ে ঝগড়া কিয়া। অব তো ম্যায় খুশিসে দে রহা হুঁ।"
- "নেহি সাব। গাড়িমে তো ম্যায় সির্ফ এক ড্রাইভার থা। লেকিন বাহারমে ম্যায় এক ইনসান হুঁ। আপকা মুশকিলমে সির্ফ থোড়া মদত কিয়া, বাস্।"

কী আর বলব! চোখে জল এসে গেল। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

এদিকে ট্রেন বোধহয় ছেড়ে গেল। তাই আর সময় নষ্ট না করে দৌড়ে ফিরলাম আমার প্লাটফর্মে। গিয়ে দেখি সেই সহযাত্রী ভদ্রলোক তখনো আমার জন্য অপেক্ষারত। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এবার শান্তমনে ট্রেনে চড়লাম। ট্রেন বোধহয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চলতে শুরু করল।

সারাটা পথ ওই মানুষরূপী ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি পর্যন্ত পাঁচ ঘন্টার রাস্তা কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

এখনও প্রায়শই ওর কথা ভাবি, আর মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। ভাবি এদের মতো লোকেরা আছে বলেই বোধহয় পৃথিবীটা এখনও চলছে।

প্রিয়নাথের অভিযোগ

শেলী শাহাবুদ্দিন

এক

মানুষের মৃত্যু হয় বিভিন্নভাবে। কোন মানুষ আত্মহত্যা করে, কোন মানুষ নিহত হয়, কোন মানুষ অপঘাতে মারা যায়, অসুখ বিসুখে মারা যায় অনেক মানুষ। বাকি প্রায় সব মানুষ মারা যায় বার্ধক্যজনিত কারণে। কিন্তু অল্প কিছু মানুষের মৃত্যু হয় সম্পূর্ণ অদৃশ্য কারণে। পৃথিবীর মানুষ ও তাদের বিজ্ঞান, এইসব মৃত্যুর কোন খবর রাখে না।

প্রিয়নাথের মৃত্যু হয়েছিল এইভাবে এক অদৃশ্য কারণে।

তমালিকা যেদিন প্রিয়নাথকে তাদের বাসায় যেতে বলে, নিজের অজ্ঞাতেই সে সেদিন প্রিয়নাথের অদৃশ্য মৃত্যুর ব্যবস্থা করে। তার আগে বা পরে কলেজের ছেলে মেয়ে কেউই কোনদিন প্রিয়নাথকে তাদের বাসায় যেতে বলেনি। প্রিয়নাথ একমাত্র রুমানাদের বাসায় যেত, কারণ তা ছিল তার হস্টেলের লাগোয়া এবং সেখানে তাদের দলের মিটিং হতো।

প্রিয়নাথের দিদির জীবন ধ্বংস হয়েছিল প্রেমের কারণে। প্রিয়নাথ তার দিদিকে খুব ভালবাসত। দিদির কষ্ট দেখে প্রিয়নাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে সে কোনদিন প্রেমের ফাঁদে পা দেবে না। প্রিয়নাথের অন্তর্যামী বোধহয় সেদিন আড়ালে বসে হেসেছিলেন।

প্রিয়নাথ তখন মফস্বল থেকে আসা সরল এক মানুষ। আর্থিক দৈন্যের কারণে তার বেশভূষা অতি সাধারণ। কিন্তু প্রিয়নাথ যা করে তা প্রবল আন্তরিকতার সঙ্গে একাগ্র হয়ে করে।

সেসময় সে ছাত্র – রাজনীতিতে প্রবেশ করে শুধুমাত্র একজন ছাত্রের মতো বিষয়টি বোঝার জন্য। দলের কাজে তার আন্তরিক প্রয়াসের কারণে সে বিষয়টি ভাল করে বোঝার আগেই তাকে দলের সাধারণ সম্পাদক বানিয়ে ফেলা হয়।

কাজেই তমালিকা যখন প্রিয়নাথকে তাদের বাসায় যেতে বলে, তার জীবনে যেহেতু এ ধরনের আমন্ত্রণ এই প্রথম, তাই প্রিয়নাথ রোমাঞ্চিত বোধ করে। বিশেষত এই কারণে যে তমালিকাকে দেখে প্রিয়নাথ মুগ্ধ হয়ে যায়।

দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর কলেজের বারান্দায় তমালিকার সাথে প্রিয়নাথের পরিচয় হয়। প্রথম

দৃষ্টিতেই প্রিয়নাথের মনে হয়েছিল তমালিকা যেন খাপ খোলা তলোয়ার। ছিপছিপে তীক্ষ্ণ দেহ, তেমনি তীক্ষ্ণ তার চোখ, মুখ, নাক। উজ্জ্বল তামার মতো গায়ের রং। পরনে প্রায় সেই রঙের শাড়ি। বিকেলের নরম আলো পড়েছে তার মুখে। সেই মুখে অদ্ভুত উজ্জ্বল এক হাসি। সেই হাসিতে রক্তিম সূর্যোদয়ের মতো উদ্ভাসিত আলো। সব মিলিয়ে যে কোন পুরুষ বধ করার শক্তি সেই মুখে।

কিন্তু প্রিয়নাথের অবধ্য হওয়ার কথা তার অভিজ্ঞতার কারণে, তার প্রতিজ্ঞার কারণে। তবু সেদিন প্রিয়নাথকে বধ করেছিল তমালিকার দুই চোখ। প্রিয়নাথ ভেবেছিল সেদিন সেই দু'চোখ প্রিয়নাথকে শুধুমাত্র মুগ্ধ করেছিল। নারীর চোখ থেকে যখন হাসির সাথে বুদ্ধির দীপ্তি আর অনির্বচনীয় আরো কিছু বিচ্ছুরিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। প্রিয়নাথ সেদিন বোঝেনি কী ছিল সেই অনির্বচনীয়। সে বয়সে হয়তো কোন পুরুষই তা বোঝে না।

আজ পরিণত বয়সে প্রিয়নাথ শুধু এইটুকু বোঝে যে, তার প্রতিজ্ঞার অকালমৃত্যু লেখা ছিল সেই দুই চোখে। সেই চোখ তখন সৃজনশীল। যেন প্রিয়নাথের প্রতিজ্ঞা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে, তার ধ্যান ভঙ্গের জন্য তমালিকার চোখদুটি কোন চতুর দেবতার নির্দেশে জেগে উঠে তার মোহজাল বিস্তার করেছিল। তমালিকার চোখদুটি দলের সদ্য নির্বাচিত তরুণ সম্পাদককে প্রশংসায় অভিষিক্ত করে, মোহিত করে, অসীম মোহন সম্ভাবনার অজস্র স্বপ্ন সৃষ্টি করে, এক অনির্বচনীয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল। প্রিয়নাথের অজান্তে সেই আলো তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। তার শপথবদ্ধ জীবন নিহত হয়েছিল। এই সবই আজ পরিণত বয়সে প্রিয়নাথ জানে।

তারপর প্রিয়নাথের নির্বোধ তারুণ্য তাকে টেনে নিয়ে যায় চামেলীবাগের সেই নিভৃত গলিতে, যেখানে তমালিকার বাসগৃহ। সেখানে তমালিকা, তমালিকার বাবা-মা, বোন, সকলে তাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে, তাকে আপন করে নেয়। প্রিয়নাথের মনে হয়েছিল, তারা সবাই তাকে ভালবাসে।

প্রিয়নাথ তার বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনে স্নেহবঞ্চিত ছিল। তমালিকার পরিবারের সকলেই যেন কোন গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রিয়নাথকে অতি দ্রুত স্নেহের বাঁধনে বেঁধে ফেলে। ফলে ভাল করে কিছু বোঝার আগেই প্রিয়নাথ তাদের সকলকে ভালবেসে ফেলে। তমালিকাকে যে প্রিয়নাথ আলাদা করে ভালবাসে সে কথা সে প্রথমে মোটেই বোঝেনি।

একদিন এক বৃষ্টির দিনে কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ দলের কাজ নিয়ে তমালিকার সাথে কথা বলছিল। হঠাৎ সদা-চঞ্চল তমালিকা বৃষ্টিস্নাত বারান্দায় পা পিছলে চার হাত নিচে পড়ে যায়। ব্যথায় তার মুখ কুঁকড়ে যায়। সে উঠতে পারে না। প্রিয়নাথ তৎক্ষণাৎ তমালিকাকে সাহায্য করার জন্য নিজেও লাফ দিয়ে নামে। কিন্তু তমালিকাকে ধরতে গিয়েই হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো পিছিয়ে আসে। কী যেন তাকে বাধা দেয়। কাছেই একজন রিক্সাচালক তমালিকাকে ধরে ধরে ওঠায়; রিক্সায় উঠে বসে তমালিকা। যাওয়ার আগে সে এক পলক প্রিয়নাথের দিকে তাকায়। সে চোখে যে গভীর ভর্ৎসনা ছিল প্রিয়নাথ তা বুঝতে পারে না। তমালিকার প্রতি তার নিজের এই আচরণে সে উদ্ভ্রান্ত বোধ করে। একসময় সে বুঝতে পারে যে সে প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয়েছে। তমালিকাকে সে ভালবেসে ফেলেছে; অথচ প্রিয়নাথ জানে যে এই পথ তার জন্য বিপজ্জনক। এই পথ সে নিজেই নিজের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে। মন শক্ত করার চেষ্টা করে। প্রিয়নাথ তমালিকাদের বাসায় যাওয়া বন্ধ করে। কলেজের যেদিকে সে তমালিকাকে দেখতে পায়, সেদিক সে এড়িয়ে চলে। দলের কাজে অন্যদের সাথে কথা বলে, কিন্তু তমালিকাকে এড়িয়ে চলে।

এইভাবে মাসের পর মাস কেটে যায়, তমালিকার কাছ থেকে প্রিয়নাথ দূরে দূরে থাকে। কিন্তু যত দিন যায়, প্রিয়নাথ অদৃশ্য তমালিকার প্রতি আরো বেশি আকর্ষণ বোধ করে। যেন খুব শক্ত আর ধারালো কোন অদৃশ্য সুতো তার গলায় ফাঁস হয়ে বসছে, আর অদৃশ্য তমালিকা আড়াল থেকে সেই সুতো টেনে টেনে প্রিয়নাথকে বঁড়শি গাঁথা মাছের মতো টেনে তুলছে।

বিভ্রান্ত তরুণ প্রিয়নাথ সিগারেটের নেশায় আশ্রয় খোঁজে। সে ঠিকমতো খায় না, ঘুমায় না। প্রিয়নাথ ক্লান্ত বোধ করে। তার দেহের ওজন বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে থাকে।

হঠাৎ একদিন গভীর রাতে তমালিকার বড়দি প্রিয়নাথকে টেলিফোন করে। তাঁদের বড় বিপদ। তমালিকার বাবা মরণাপন্ন। প্রিয়নাথ রিক্সা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। চিকিৎসককে আর হস্টেল থেকে তমালিকাকে সঙ্গে নিয়ে

যেতে হবে চামেলীবাগের বাসায় | তমালিকার হস্টেল আর চিকিৎসকের বাসস্থান কাছাকাছি|

বাবার অসুখের কথা শুনে হস্টেলের সামনেই তমালিকা হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো মাটিতে বসে পড়ে | তমালিকার সেই শিশুর মতো অসহায় রূপ দেখে গভীর মায়ায় প্রিয়নাথের প্রবল ইচ্ছা হয় তমালিকাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে| নিজের মনকে কঠোর শাসন করে প্রিয়নাথ ইচ্ছাটা দমন করে | তমালিকাকে একটা রিক্সায় উঠিয়ে দিয়ে চিকিৎসককে নিয়ে সে অন্য রিক্সায় ওঠে|

চিকিৎসক রুগীকে পরীক্ষা করে নানারকম ইনজেকশন দিয়ে রুগীর ব্যথা কমান; ঘুমের ওষুধ দেন | প্রিয়নাথ আর বড়দি সারারাত জেগে রুগীকে পাহারা দেয় | তমালিকা খালি কাঁদে | সেই কান্না প্রিয়নাথকে কাতর করে তোলে | প্রিয়নাথ মনে মনে প্রার্থনা করে, "ঈশ্বর, আমাকে নিয়ে তমালিকার বাবাকে ভাল করে দাও |"

পরের দিন রুগীকে ভর্তি করা হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে | দিনের বেলা তমালিকা বাবার কাছে থাকে | তমালিকার বড়দি কলেজে পড়ায়, তাই বড়দি থাকে রাতে | প্রিয়নাথ প্রতিদিন দেখে যায় | প্রয়োজনীয় কোন কাজ থাকলে করে দেয়, বিশেষ করে বাইরের কাজ – এটা সেটা কিনে আনা, রুগীর জন্য কী কী করণীয় তা চিকিৎসক এবং নার্সের কাছে জেনে নেওয়া, ইত্যাদি | কিন্তু যতক্ষণ প্রিয়নাথ তমালিকার কাছাকাছি থাকে, ততক্ষণই সে মনে মনে এক দুর্বোধ্য ঝড়ের সাথে লড়াই করে | তমালিকার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে প্রিয়নাথের বিপর্যস্ত অন্তর চুম্বক পাহাড়ের দিকে ডুবন্ত জাহাজের আত্মঘাতী আবেগে ধাবিত হয়|

বড়দি সব কাজ সেরে একটু দেরি করে হাসপাতালে আসে| এক সন্ধ্যায় হাসপাতালের কেবিনে প্রিয়নাথ মেঝের ওপরে একখানি দীর্ঘ কালো চুল আবিষ্কার করে | সে ধরে নেয় যে চুলটি তমালিকার| তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় | সাবধানে ও গোপনে চোরের মতো সে চুলটি সংগ্রহ করে ঘরে গিয়ে একটি কৌটোয় চুলটি সযত্নে রেখে দেয় | প্রতিরাতে ঘুমের আগে চুলটি বের করে বহুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে| মনে মনে সে তমালিকার প্রতীক হিসাবে চুলটির পূজা করে | এইভাবে দস্তয়ভস্কির শ্বেতরাত্রির নায়কের মতো প্রিয়নাথ গোপনে তার অন্তরে এক রহস্যময় কল্পলোক গড়ে তোলে|

দুই

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেও তমালিকার বাবার সুস্থ হতে সময় লাগে| তাঁকে দীর্ঘদিন শুয়ে থাকতে হয়| এই দীর্ঘ সময় তমালিকা বিষণ্ন থাকে | প্রিয়নাথ তমালিকার বিষণ্নতা কমাবার জন্য তাকে নানাভাবে অভয় দিতে চেষ্টা করে; শুধু সে তার প্রার্থনার কথা গোপন রাখে, তমালিকার বাবার জন্য যে প্রার্থনা সে তখনও প্রতিদিন করে|

একদিন রাতে চামেলীবাগের বাসায় এসে প্রিয়নাথ শোনে যে তমালিকা তার বাবার জন্য হঠাৎ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে | সেদিন সারাদিন সে খায়নি | তাকে খাওয়াবার চেষ্টা করে সকলেই ব্যর্থ হয়েছে| এখন পরিবারের সকলে প্রিয়নাথকে অনুরোধ করে তমালিকাকে খাওয়াবার জন্য | প্রিয়নাথের পরম সৌভাগ্য যে সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে অনুরোধ, অনুনয় করার পরে তমালিকা শেষ পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করে|

কিন্তু যেকথা কেউ কোনদিন জানতে পারেননি তা হ'ল এই যে, তমালিকাকে নিজহাতে খাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রিয়নাথের মনে সেদিন যে গভীর আকুলতার সৃষ্টি হয়েছিল, স্বেচ্ছায় সে ইচ্ছা দমন করায় প্রিয়নাথের মনে আজও সেই ঘটনা তার জীবনের অন্যতম বঞ্চনার স্মৃতি হয়ে হাহাকার করে|

আজ শেষ জীবনে এসে প্রিয়নাথ মাঝে মাঝে ভাবে, সেদিন তমালিকাকে নিজহাতে খাইয়ে দিলে হয়তো তাদের দুজনের জীবনের পরিণতি অন্যরকম হতো | কে জানে, তমালিকা হয়তো তাই চেয়েছিল | হয়তো তমালিকার বাবা-মাও তাই চেয়েছিলেন|

এই অসুখের পর থেকে প্রিয়নাথ তমালিকার হুকুমে চলে| প্রথমে সেগুলি অনুরোধ হয়ে আসত | তারপর কখন যে সেসব হুকুমে রূপান্তরিত হয়ে যায় দুজনের কেউই তা জানতে পারে না| তমালিকার সকল হুকুম প্রিয়নাথ পালন করে যায় মুখ বুজে| তমালিকাকে সে অনেক কিছুই বলতে চায়, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না|

এবিষয়ে প্রিয়নাথের সমস্যা দুটি – প্রথমত তার মনে হয়, প্রত্যাখ্যান সে সইতে পারবে না| কিন্তু তার চাইতে বড় কথা, তমালিকা যদি সামান্যতম অপমানিত বোধ করে, সেই ভয়ে সে নীরব থাকে| এটিই তার প্রধান দুর্বলতা|

দিদির স্মৃতি প্রিয়নাথের এই দুর্বলতার অন্যতম কারণ। দিদির দুঃখ সে ভুলতে পারে না। তার অন্তরে যেন দিদির আত্মা হুকুম করে, 'কোন নারীকে অপমান করার আগে মৃত্যুবরণ কর।' ফলে বিকল্প হিসাবে প্রিয়নাথের কল্পনাপ্রবণ মন অসম্ভব সব চিত্রকল্প তৈরী করে। ভাবে শ্রদ্ধা দিয়ে সে তমালিকার মন জয় করবে। সে যদি তার সমস্ত মনপ্রাণ তমালিকার পায়ে নিবেদন করে, নিশ্চয় তমালিকা কোন একদিন তাকে পুরস্কৃত করবে। তার মন তমালিকার দাসে পরিণত হয়। যতই দিন যায়, ততই সে তমালিকার সকল হুকুম মুখ বুজে পালন করে যায়।

অন্যদিকে এই একতরফা সেবা পেয়ে পেয়ে তমালিকার অন্তর নগরনটী 'শ্যামা' বা 'সামান্য ক্ষতি'র রাজমহিষীতে রূপান্তরিত হয়। যে ভক্ত কিছুই চায় না, তাকে সে বড় জোর অনুকম্পা করে; আর কিছুই নয়। প্রিয়নাথ তার সকল হুকুম অন্ধভাবে পালন করে। একসময় তা আর তমালিকাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হয় না। তখন তমালিকার হুকুম মেনে চললেও প্রিয়নাথ ক্রমাগত তিরস্কৃত হতে থাকে। তমালিকা প্রত্যেক বিষয়ে তার ভুল ধরে।

দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য একটি বই প্রয়োজন তমালিকার। প্রিয়নাথ অনেক খুঁজে একটি পুরনো বই একটু কম দামে পেয়ে যায়। তমালিকাকে যখন সে বইটি দেবে, তখন তমালিকার চোখে মুখে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার যে আলো জ্বলে উঠবে, সেই আলোক উৎসবের কল্পনায় বিভোর প্রিয়নাথ হেঁটে হেঁটে তমালিকার হস্টেলে গিয়ে খবর পাঠায়।

দোতলা থেকে তমালিকা নেমে আসে। কিন্তু বই হাতে নিয়ে বইয়ের মলিন চেহারা দেখে তমালিকার মুখও মলিন হয়ে যায়। দরিদ্র প্রিয়নাথ তার কৃপণতার জন্য তিরস্কৃত হয়। এতক্ষণ প্রিয়নাথ যে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল তা তমালিকার মুখের এক ফুৎকারে মিলিয়ে যায়।

এইভাবে হতভাগ্য প্রিয়নাথ একদিন আরো বড় অপরাধ করে বসে। শেষ পরীক্ষায় তমালিকা একটি বিষয়ে ভাল করতে পারে না। সেই বিষয়ের অধ্যাপক প্রিয়নাথকে ছাত্র হিসাবে খুব স্নেহ করতেন। তমালিকার পরীক্ষা কেমন হয়েছে তা জানার জন্য তমালিকা অনুনয় করে প্রিয়নাথ যেন অধ্যাপককে অনুরোধ করে। ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে প্রিয়নাথ বন্ধু ছাড়া আর কারো কাছে কোনদিন এ ধরনের অনুরোধ করেনি; কিন্তু তমালিকার অনুনয় প্রিয়নাথের জীবনে বিরল সম্পদ। প্রিয়নাথ লজ্জা, ভয়, সংকোচ বিসর্জন দিয়ে অধ্যাপকের কাছে যায়। অধ্যাপক মানুষটি অসাধারণ। নীতিবোধ তাঁর কঠোর। প্রিয়নাথের প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে কী যেন বুঝেছিলেন। প্রিয়নাথের মুখে কী দেখেছিলেন তা তিনিই জানেন। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে প্রিয়নাথকে শুধু বলেছিলেন, "তমালিকা ফেল করেনি, একথা তাকে তুমি জানাতে পারো।"

ব্যস, কূটবুদ্ধিহীন প্রিয়নাথ তমালিকাকে হুবহু অধ্যাপকের কথাটাই জানায়। শুনে তমালিকা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে – "আমি ফেল করতে পারি এমন কথা আপনি ভাবলেন কী করে? আমি অনেক দেখেছি। আপনারা সবাই সমান। মেয়েদের প্রতি আপনাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। আপনার সাথে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। দূর হয়ে যান আমার সামনে থেকে।" কথাটা বলে গটগটিয়ে চলে যায় 'কাশীর মহিষী করুণা।' কূটবুদ্ধিহীন প্রিয়নাথ ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকে। বহুদিন বহু সুযোগ পেয়েও শুধুমাত্র শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য শত আকুলতা সত্ত্বেও প্রিয়নাথ তমালিকাকে আজ অবধি কোনদিন স্পর্শমাত্র করেনি, তার মুখে এই কথা? প্রিয়নাথ হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

এইভাবে উপর্যুপরি অকারণে তিরস্কৃত হতে হতে প্রিয়নাথের মনে হয় তার জীবন অর্থহীন। রাতে সে তমালিকার সেই একগাছি চুলের কাছে আশ্রয় খোঁজে। কোন কোনদিন প্রিয়নাথ সমস্ত রাত ওই একখানি চুলের দিকে তাকিয়ে থাকে। এদিকে উপর্যুপরি তিরস্কার তমালিকার কাছেও বিরক্তিকর আনন্দহীন হয়ে ওঠে। ফলে কিছুদিন পর তমালিকা প্রিয়নাথের ওপরে আরো কঠোর হয়ে ওঠে। সে প্রিয়নাথকে নানাভাবে অপমান করতে চেষ্টা করে। অপমানিত দিশাহারা প্রিয়নাথ কাজের মধ্যে ডুব দিতে চেষ্টা করে। লেখাপড়া মাথায় ওঠে। তার নিজের খাওয়ার টাকা জোটে না, কিন্তু দলের কাজে প্রিয়নাথ মাঝে মাঝে সেই খাওয়ার টাকাও খরচ করে। দলের নেতারা প্রিয়নাথের ওপরে তাই খুব খুশি। পড়াশোনা শেষে প্রিয়নাথকে দলের জেলা কমিটির সভাপতি করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রিয়নাথের ভেতরে মহামূল্যবান কিছু একটা যে ধ্বংস হতে চলেছে, তা তাঁরা কেউ জানেন না, জানার চেষ্টাও করেন না।

"এক প্রহরের প্রমোদে তোমার যে কটি কুটির হ'ল ছারখার" সে কথা সকলেরই অজানা রয়ে গেল।

এসময় ধুমধাম করে দলের মহাসম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। বোধহয় আড়ালে বসে প্রিয়নাথের অন্তর্যামী তখন তাঁর কলকাঠি নাড়েন আর হাসেন।

প্রিয়নাথ ছোটবেলা থেকেই মঞ্চে নাটক করে। কিন্তু এখন না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে শুটকি হয়ে গেছে, সে আর সুদর্শন সুপুরুষ নয়। হয়তো সে কারণে, বা যে কারণেই হোক, সম্মেলনে নাটক করার জন্য প্রিয়নাথকে না নিয়ে অন্য কলেজ থেকে একজনকে নায়ক নির্বাচন করা হয়। তমালিকা সেই নাটকের নায়িকা। তমালিকা অসাধারণ অভিনয় করে। কিন্তু হতভাগ্য প্রিয়নাথের সেই অভিনয় দেখার সৌভাগ্যটুকুও হয় না। দলের একজন নেতা হয়েও জ্যেষ্ঠ নেতাদের হুকুমে তাকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। গ্রাম্য, সরল প্রিয়নাথ নাট্য জগতের কূটনীতি এড়িয়ে চলে, এবং সে কখনও তার নেতাদের হুকুমের অবাধ্য হয় না।

তিন

নতুন নায়ক ও নায়িকার ঘনিষ্ঠতার গুজব প্রিয়নাথের কানে আসে। নায়ক শিক্ষিত ধনী পরিবারের সন্তান। ঢাকায় তাদের প্রাসাদোপম গৃহ। তার চালচলন, তার সম্ভ্রান্ত পোশাক, প্রিয়নাথের দারিদ্রকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তমালিকার দৃষ্টিতে তখন প্রিয়নাথ যেন ভিখিরি। প্রিয়নাথ হতাশায় ডুবে যেতে শুরু করে। কিন্তু গুজবে তার বিশ্বাস হয় না। সে ডুবন্ত মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত প্রিয়নাথ তমালিকার সাথে খোলাখুলি কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কীভাবে এই অসম্ভব কাজ সে সম্ভব করবে তা ভেবে পায় না।

প্রিয়নাথ জানে যে তমালিকা তখন কিছুদিন ধরে চামেলীবাগের বাসা থেকে কলেজে আসে। সারাদিন ভেবে ভেবে ঠিক করে যে খুব ভোরে সে চামেলীবাগের মোড়ে অপেক্ষা করবে। তমালিকা যখন রিক্সা করে মোড়ের মাথায় আসবে, তখন সে তমালিকার সাথে কথা বলবে। ফলে ভয়ে উত্তেজনায় সারারাত প্রিয়নাথ জেগে থাকে। সে রাতে তার পক্ষে শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বসে থাকলেও অসহ্য মনে হয়। বারবার সে উঠে পায়চারি করে। ঘুমের ওষুধ খায়, কিন্তু কোন লাভ হয় না। একসময় তার উত্তেজনা এমন চরমে ওঠে যে হঠাৎ তার মনে হয় তার শরীরের চামড়ায় হাজার হাজার ছুঁচ ঢুকছে। ছুঁচের খোঁচায়, যন্ত্রণায় সে ঘেমে ওঠে; দৌড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর যন্ত্রণা কমে আসে। প্রিয়নাথ ঘরে ঢোকে। শোয়, বসে, পায়চারি করে।

হঠাৎ আবার তার সারা শরীরে ছুঁচ ঢোকে। আবার সে দৌড়ে বাইরে যায়। এইভাবে সমস্ত রাত প্রিয়নাথ ঘরে বাইরে ছুটোছুটি করে কাটায়। প্রিয়নাথের মনে সন্দেহ হয় যে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

একসময় ভোর হয়ে আসে। প্রায় অন্ধকার থাকতেই প্রিয়নাথ পাজামা-পাঞ্জাবি পরে রিক্সা নিয়ে চামেলীবাগে চলে আসে। সে বুঝতে পারে যে এখনও তমালিকার আসার সময় হয়নি। চামেলীবাগের সেই গলির মোড়ে একটা ছোট চায়ের দোকান ছিল; প্রিয়নাথ সেই দোকানে বসে চায়ের ফরমাশ দেয়। তার মনে হতে থাকে যে সে একটি অপরাধমূলক কাজ করছে। তমালিকার সাথে যখন সে কথা বলবে, তখন পৃথিবীময়, তার জীবনময়, কী ভয়ানক জলোচ্ছ্বাস ঘটে যাবে, কী ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্প শুরু হবে, তা ভেবে তার বুক কাঁপতে থাকে।

এইভাবে বহুক্ষণ কেটে যায়। চা খেয়ে সে দোকান থেকে বের হয়ে আসে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সে দোকানে ঢোকে, আবার চা খায়। আবার বের হয়ে আসে। রোদের তেজ বাড়ে। কিন্তু সে তমালিকার দেখা পায় না। একসময় প্রিয়নাথের মনে হয় যে তমালিকা হয়তো ইতিমধ্যে তার অজান্তেই কলেজে চলে গেছে। আবার এমনও হতে পারে যে তমালিকা কোথাও যায়নি। কিন্তু তমালিকাদের ছোট্ট বাসায় তার যা বলার, তা বলতে গেলে তাকে সবার সামনেই বলতে হবে। কাজেই বাসায় যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।

কয়েকদিন পর অনেক ভেবে, অনেক সাহস সঞ্চয় করে প্রিয়নাথ তমালিকাদের বাসায় টেলিফোন করে। তমালিকাই ফোন ধরে। গলা শুকিয়ে কাঠ, তবু দুরু দুরু বুকে সে বলে, "তমালিকা, তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল।"

- "না, আপনার সাথে আমার কোন কথা নেই।" তমালিকার কঠোর, গম্ভীর, নিষ্ঠুর কণ্ঠ।

প্রিয়নাথ স্তম্ভিত হয়ে যায়; এই কণ্ঠ সে কোনদিন শোনেনি। এই

নিষ্ঠুর তমালিকাকে সে কোনদিন দেখেনি | এই তমালিকাকে প্রিয়নাথ চেনে না |

প্রিয়নাথ সামন্ত পরিবারের সন্তান, তাঁরা বংশপরম্পরায় রক্ষণশীল | প্রিয়নাথ সেই রক্ষণশীলতাকে ঘৃণা করে | ছোটবেলা থেকে প্রিয়নাথ তার বিকল্প খোঁজে | তমালিকাদের আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে সে সেই বিকল্প দেখতে পেয়েছিল, এবং সেখানে তার পরিশ্রান্ত হৃদয় আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তিলাভ করেছিল | এই পরিবারটিকে সে শ্রদ্ধা করে তাদের প্রগতিশীলতার জন্য |

আজ সেই আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মেয়ে তমালিকা তার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে ছোট্ট একটি বাক্যে | সে প্রিয়নাথের মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, কিছু না জেনে, না শুনে | প্রিয়নাথ এই এতদিন ঘুণাক্ষরেও কখনও তমালিকাকে বলেনি, বলতে পারেনি যে, সে তমালিকাকে ভালবাসে | সর্বোপরি, তমালিকাকে কোনদিন সে বিন্দুমাত্র অসম্মান করেনি, বরং সে তমালিকার প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছে | তমালিকার প্রতিটি হুকুম নিঃশব্দে পালন করেছে | তাহলে কোন অপরাধে আজ তমালিকা তার কণ্ঠরোধ করেছে, তা প্রিয়নাথের মাথায় আসে না |

তমালিকা কি বুঝে ফেলেছে যে প্রিয়নাথ তাকে ভালবাসে? তাই যদি তার প্রতি তমালিকার বিতৃষ্ণার কারণ হয় আজ, তাহলে কেন সে প্রিয়নাথকে এতদিন সতর্ক করে দেয়নি?

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্রিয়নাথ তমালিকার পরিবারের সেবা করেছে | সেই পরিবারের প্রত্যেকের সাথে তার এমন ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়েছে যে প্রিয়নাথ এখন এই পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসে | আশ্চর্য বিষয় এই যে, মৃত দিদিকে ছাড়া প্রিয়নাথ তার নিজের বাড়ির লোকদেরও এতটা ভালবাসে না, যতটা সে তমালিকার বাড়ির লোকদের ভালবাসে |

তমালিকা কি জেনেশুনে প্রিয়নাথের এই সর্বনাশ করেছে? কোন অপরাধে তমালিকা প্রিয়নাথকে এই শাস্তি দিয়েছে তা প্রিয়নাথের বুদ্ধির অগম্য হয়ে থাকে |

চার

প্রিয়নাথ এক নতুন জীবনে প্রবেশ করে | এসময় থেকে যখন তখন তার শরীরে ছুঁচ ফোটে | উত্তেজনায়, ভয়ে, যে কোন দুঃসংবাদে, কোন বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে, এমনকি কোন গুরুতর বিষয়ে ভাবতে গেলেও তার শরীরে ছুঁচ ফোটে | ফলে পরীক্ষার সময় শিক্ষকের মুখে প্রশ্ন শুনেও তার শরীরে প্রচন্ড ছুঁচ ফোটা শুরু হয় | সে জানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না; পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় |

দলের কাজে তাদের একজন রাজনৈতিক গুরু থাকেন; সকল বিষয়ে, এমনকি ব্যক্তিগত সমস্যা হলেও রাজনৈতিক গুরুকে তা জানাবার নির্দেশ ছিল তাদের ওপরে | নিরুপায় প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত তাই করে | কয়েকদিন পরে প্রিয়নাথের গুরু তমালিকার সাথে কথা বলে প্রিয়নাথকে তমালিকার উত্তর জানান |

তমালিকা জানিয়েছে যে প্রিয়নাথ যেন ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তমালিকার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা না করে | কিন্তু তমালিকাদের পরিবারের সাথে প্রিয়নাথের যে ঘনিষ্ঠতা তা যেন প্রিয়নাথ অক্ষুণ্ন রাখে |

তমালিকার কথার অর্থ সে বুঝতে চেষ্টা করে | প্রিয়নাথের গুরু প্রিয়নাথের আত্মহত্যার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন | কিন্তু প্রিয়নাথ যে নিহত হতে পারে সে বিষয়টি গুরুর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে যায় | প্রিয়নাথ বোবা হয়ে থাকে | অনেক ভেবেও সে তমালিকার পরস্পরবিরোধী কথার অর্থ বুঝতে পারে না |

এইভাবে বহুদিন কেটে যায় | প্রিয়নাথ তমালিকার নির্দেশ অমান্য করতে পারে না | তার কারণ তমালিকা নয়, তমালিকার নিষ্ঠুরতাও নয় | তার একমাত্র কারণ প্রিয়নাথের অদ্ভুত চরিত্র |

তমালিকাকে প্রিয়নাথ তিলে তিলে সৃষ্টি করেছে তার নিজের মনের ভেতরে | তমালিকার কারণে প্রিয়নাথ তার দিদির লাঞ্ছনা অপমান ভুলে, তার প্রতিজ্ঞা ভুলে, তাকে ভালবেসেছে | তমালিকা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি | তমালিকা তার প্রথম ভালবাসা, তার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা | তমালিকার আসনে প্রিয়নাথ এ জীবনে অন্য কোন নারীকে বসাতে পারবে না | তমালিকার কোন ক্ষতি প্রিয়নাথ দেখতে চায় না | নিরুপায় বোকা প্রিয়নাথ তমালিকার পরস্পরবিরোধী নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যায় বাকি জীবন |

তমালিকাদের পরিবারের যে কোন মানুষের আপদে-বিপদে খবর পেলেই প্রিয়নাথ ঝাঁপিয়ে পড়ে | দিনের পর দিন তাদের সেবা করে | আর তমালিকার কোন অসুখের বা বিপদের খবর

পেলে প্রিয়নাথের অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়, দগ্ধ হয়। কিন্তু প্রিয়নাথ তমালিকার কাছ থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকে। কারণ তাই ছিল তমালিকার নির্দেশ।

শ্বেতরাত্রির নায়ক মনে মনে তার সৃষ্টিকে একই একাগ্রতায় ভালবেসে যায় বাকি জীবন। সে যেন তার নিজের সৃষ্টির কোন অসম্মান না করে, সে বিষয়ে তার হৃদয় অতন্দ্র প্রহরী হয়ে জেগে থাকে। কিন্তু তার মনের গোপনে এক যন্ত্রণা সমস্ত জীবন তাকে লাঞ্ছিত করে। তমালিকা এখন তার কেউ নয়, সেই সত্যের বাস্তবতা সে মেনে নিয়েছে। তমালিকা কাকে তার জীবনসঙ্গী করবে সে সিদ্ধান্ত কেবল তমালিকার, এই বাস্তবতাও প্রিয়নাথ মেনে নিয়েছে।

কিন্তু তমালিকা যে প্রিয়নাথের সাথে শেষবারের জন্য কথা বলতে রাজি হয়নি, সে বিষয়ের কোন যৌক্তিকতা প্রিয়নাথ বুঝতে পারে না। প্রিয়নাথ এই পৃথিবীরই মানুষ। তার ধারণা জীব হিসাবে, মানুষ হিসাবে তার কিছু অধিকার আছে, মর্যাদা আছে। তমালিকা তাকে ভাল না বাসতে পারে, কিন্তু সে তাকে মানুষের মর্যাদা দিতে পারত।

অথচ প্রিয়নাথ যখন তমালিকার কাছে, কাতর হয়ে শুধু একবার কথা বলার অনুমতি ভিক্ষা করে, তমালিকা তখন তাকে পরম উপেক্ষায় ছেঁড়া কাগজের মতো বর্জন করে দেয়। যেন প্রিয়নাথ তমালিকার চেনা-জানা কেউ নয়, যেন তমালিকার জন্য প্রিয়নাথ কথা বলার মতো মানুষই নয়। প্রিয়নাথের তখন মনে হয়, তার কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ যাকে সে ভালবাসে, যাকে সে তিল তিল করে তার কল্পনায় গড়ে তুলেছে, তার কাছেই প্রিয়নাথের কোন অস্তিত্ব নেই, কোন সম্মান নেই। কিন্তু কেন? সে তো তমালিকাকে ভালবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে ঘিরে রাখতে চেয়েছিল। ভালবাসা আর শ্রদ্ধা তো কোন অপরাধ নয়। তাহলে কোন অপরাধে আত্মপক্ষ সমর্থনে বঞ্চিত সে? যে সকল মূল্যবোধকে আদর্শ মনে করে প্রিয়নাথ তার ভালবাসাকে অপরূপ করে তুলতে চেয়েছিল, তার সেই সব মূল্যবোধ কি ভ্রান্ত, অনাকাঙ্ক্ষিত? আর তাই কি তমালিকা তাকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করে? এই সব ধারণা আর দুশ্চিন্তার বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে প্রিয়নাথের সকল আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে দেয়। এইসব উপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ সর্বস্বান্ত বোধ করে।

এইভাবে তমালিকা একজন মানুষকে অনায়াসে পুরোপুরি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

প্রিয়নাথের মনে হয়, জীবন তার ওপরে যে অবিচার করেছে, তা ছিল ঘোরতর অন্যায়। সে কারো কোন ক্ষতি করতে চায়নি। কারো ওপরে সে জোর খাটাতেও চায়নি। সে শুধু ভালবাসার অধিকার চেয়েছিল, আর চেয়েছিল আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ। সেজন্য মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শ্রেষ্ঠ নীতিমালা যা হওয়া উচিত বলে তার মনে হয়েছে, নিজের আচরণে প্রিয়নাথ প্রাণপণে সেইসব আদর্শ আর নীতিমালা প্রয়োগ করেছে। নিজেকে সংযত রেখেছে। তমালিকাকে স্পর্শ করার সুযোগগুলিও প্রতিহত করেছে। ভেবেছিল সেজন্য জীবন তাকে পুরস্কৃত করবে। অথচ জীবন তা না করে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেলে প্রিয়নাথের মনে এই অভিযোগগুলি থাকত না। ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রিয়নাথের মনের গভীরে শুধু এই যন্ত্রণাময় অনুভূতি আমৃত্যু বেঁচে থাকে। প্রিয়নাথের উপলব্ধি এই যে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার আগে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

প্রিয়নাথের জীবনের ওপরে তমালিকা যে রায় দিয়েছিল, তার মধ্যে সুবিচার ছিল না। ছিল উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা, অন্যায়, আর অবিচার। মনের গভীরে এই ছিল প্রিয়নাথের অভিযোগ, দুঃখ আর চরম অভিমান।

এবং এইভাবেই প্রিয়নাথের অদৃশ্য মৃত্যু ঘটেছিল।

আলাদা

সুজয় দত্ত

সন্ধ্যের মুখোমুখি প্রায় ফাঁকাই হয়ে যায় পার্কটা | সারা বিকেল কচিকাঁচাদের হুটোপাটি, স্কুলফেরত ছেলেমেয়েদের রকমারি খেলাধুলো, প্রেমিক-প্রেমিকাদের যুগলবিহার আর বয়স্ক-বয়স্কাদের সারমেয়বিহার অর্থাৎ কুকুর চরানোর পর গোধূলিবেলায় সবাই ঘরমুখো হলে আমি আস্তে আস্তে এসে ওখানে বসি আর নৈঃশব্দ্য উপভোগ করি | নৈঃশব্দ্য মানে মানুষের কলরব-বর্জিত এক প্রগাঢ় নৈসর্গিক প্রশান্তি, যার নিজস্ব সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা আছে – আছে অপরূপ পশ্চাদপট | স্তিমিত হয়ে আসা আলোয় চারপাশের রেড পাইন, বার্চ, ট্যামারাক আর সিডার গাছগুলো তাদের গথিক গীর্জার চূড়ার মতো উঁচু মাথা আকাশের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে | তাদের ছায়ায় ছায়ায় রহস্যময় সন্ধ্যে নেমে আসে পার্কের সবুজ ঘাসের গালচেতে | চারদিকে তখন কুলায় ফেরা পাখীদের কূজন – বুলবুলি, মকিংবার্ড, নাটহ্যাচ, রেন, চিকোডিদের মাঝে ভাল করে নজর করলে দু'একটা কার্ডিনালের লাল বা গোল্ডফিঞ্চের হলুদও চোখে পড়ে মাঝে মাঝে | সেই নির্জন আলো আঁধারীতে মগ্ন হয়ে বসে থাকতে থাকতে নিজেকে যেন মনে হয় আদিম পৃথিবীর কোনো রাজা – চারপাশে উদার প্রকৃতি আর মাঝখানে আমি একা | না, একটু ভুল বললাম | পুরোপুরি একা নই | আরেকজন থাকে এইসময় পার্কে | শুধু ওই একজনই | আমারই মতো বিকেলের ভীড় এড়িয়ে সন্ধ্যের মুখোমুখি নিঃশব্দ পদচারণায় আসে | আর বিশাল পার্কটার গাছগাছালির সীমারেখা বরাবর হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যেন মিলিয়ে যায় | ফিরেও তাকায় না আমার দিকে | আমিও তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখি না কোনোদিন | লম্বা চেহারা, বয়সের ভারেই বোধহয় শরীরটা একটু ঝুঁকে থাকে সামনে, মাথায় একটা লাল বেসবল টুপি আর হাঁটার ধরনটা একটু অদ্ভুত | এটুকুই যা চোখে পড়েছিল দূর থেকে | এছাড়া আরেকটা ব্যাপারও নজর এড়ায়নি, কারণ সেটার কখনো ব্যতিক্রম হয় না | লোকটার দুহাতে দুটো চেনে বাঁধা বড়সড় কুকুর আর কাঁধে আরেকটা | কাঁধেরটাও খুব ছোট নয় | প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, একটু হাসিই পেয়েছিল | তিনটে হাত না থাকলে বোধহয় তিনটে কুকুর পোষা উচিত নয় |

এক শরতের পড়ন্ত বিকেলে স্ফটিক-নীল আকাশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যখন লাল-কমলার আবির মাখানো, আর চারপাশের পর্ণমোচীদের ঝরতে থাকা পাতায় সবুজ ঘাসের ওপর সোনালি-হলুদ গালচে, হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল বসে না থেকে ফাঁকা পার্কটায় আমিও একটু হাঁটি | বাতাসে হিমের পরশ, তাই গায়ের উইন্ড-চিটারটার দু'পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে গাছগাছালির

মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম একর্ন আর পাইনকোন মাড়িয়ে | আনমনে একটা অসমাপ্ত লেখার কথা ভাবতে ভাবতে | পরদিনের কাগজে বেরোবে, সেই রাতেই শেষ করা চাই | হ্যাঁ, আমি একজন সাংবাদিক | ফ্রীল্যান্স, তবে কয়েকটা কাগজে নিয়মিত কলাম লিখি | শেষ মুহূর্ত অবধি কাজ ফেলে রাখা স্বভাব নয় আমার, কিন্তু সেদিনের সেই সাপ্তাহিক কলামের বিষয়বস্তুটা কিছুতেই মনে ঠিক দানা বাঁধছে না | নানারকম চিন্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তন্ময় হয়ে রয়েছি, হঠাৎ কিসে যেন হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়লাম বনপথে | একটা বেশ মোটাসোটা ডাল ভেঙে পড়ে আছে আড়াআড়ি দুটো গুঁড়ির মাঝখানে, দেখতে পাইনি | সামলে নিয়ে গায়ের মাটি ঝেড়ে উঠতে চেষ্টা করার আগেই কুকুরের তীব্র চীৎকারে চমকে গেলাম | একটা নয়, দুটো কুকুর ডাকছে | আজ তো পার্কে আমি ছাড়া জনমনিষ্যি ছিল না – এ কি তবে বুনো কুকুর নাকি? কিছু করে ওঠার আগেই একটা ভারী গলা কানে এল, "প্রিন্স, হেই প্রিন্স, নো নো নো, ডোন্ট ডু দ্যাট | অ্যান্ড হেই ইউ গোল্ডরাশ – স্টপ ইট! আই সে স্টপ ইট!" তাকিয়ে দেখি সেই আধো অন্ধকারে সামনের ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে আমার দিকে | মাথায় বেসবল ক্যাপ | দুহাতের চেনে বকলস বাঁধা দুটো কুকুর ধমক খেয়ে ঘেউ ঘেউ থামালেও রাগে গরগর করছে আমাকে দেখে | কাঁধেরটার মুখে অবশ্য টুঁ শব্দটি নেই | আর তখনই লক্ষ্য করলাম সেই জিনিসটা, যা এতদিন দূর থেকে দেখে বুঝিনি | দুটো কুকুরই প্রতিবন্ধী |

একটার সামনের বাঁ পা খোঁড়া, অন্যটার পিছনের ডান পা আদৌ নেই। দুজনেই দিব্যি তিনপায়ে হাঁটছে, কষ্ট করে চলাফেরা নয় কারোরই।

- "আর ইউ ওকে ম্যান? হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ইন দিজ উডস" আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ডান হাতের চেনটা বাঁ হাতে চালান করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন ডানহাত। আমি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে সে-হাতে মৃদু করমর্দন করে বললাম, "আই অ্যাম ফাইন। নাইস টু মিট ইউ।" শক্ত, কড়া পড়ে যাওয়া হাত। বয়সে ইনি বেশ খানিকটা বড়ই হবেন আমার চেয়ে।

- "ইয়াহ। ডেভ হিয়ার। ডেভ লোগান।"

- "স্যাম সেন।" নিজের নামটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বললাম। আমার কর্মজগতেও অনেক সময় 'শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত' নামটাকে কেটেছেঁটেই বলি।

- "ডোন্ট রিকল সিইং ইউ বিফোর। নিউ টু দিস এরিয়া?"

উত্তরে জানালাম, না, প্রায় দু-বছর হয়ে গেল এই শহরে। এই পার্কে নিয়মিত আসি, তাই আগেও বহুবার দেখেছি দূর থেকে।

- "তাই নাকি? আমি তো দেখিনি। আসলে এই এরা সঙ্গে থাকলে অন্য কোনদিকে খেয়াল রাখা মুশকিল।"

- "তা বটে। আচ্ছা, কী জাতের কুকুর এ দুটো?"

- "এটা ল্যাব্রাডর, ওটা গোল্ডেন রিট্রিভার..."

- "বাঃ, দুটোকেই খুব সুন্দর দেখতে।"

- "সত্যি বলছ?"

- "অবশ্যই। কেন বলুন তো?"

- "না, মানে, দেখতেই তো পাচ্ছ, ওরা আর পাঁচটা কুকুরের থেকে... যাকে বলে – একটু আলাদা। লোকের ওটাই আগে চোখে পড়ে।"

- "আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

- "নিশ্চয়ই।"

- "কাঁধে যে রয়েছে তাকে তো হাঁটতে দেখিনি কখনো। কোনো কারণ আছে কি? ওর তো পায়ে কিছু..."

- "ওহো, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভুলে গেছি। মীট উইথ শ্যান্টেল। কম অন লেডি, সে হ্যালো, সে হ্যালো টু হিম। হাঃ হাঃ, শি ইজ শাই।"

- "শ্যান্টেল? চমৎকার নাম। তা, ও কি আপনার ঘাড়ে চেপে বেড়ায় এই দুই মূর্তিমানের ভয়ে?"

- "ভয়? আর ইউ কিডিং? এ হ'ল বস্টন টেরিয়ার, এদের ভয়ডর থাকে না। আসলে..."

- "আসলে?"

- "ও তোমার গন্ধ পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। ও অন্ধ। তাছাড়া ওর শরীরের ডানদিকটা প্যারালাইজড। এই যে, দ্যাখো।"

আমি দেখব কি, বিস্ময়ে আমার মুখে তখন কথা সরছে না। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের বেড়ানো কি এখনো বাকি আছে?"

- "হঠাৎ এ প্রশ্ন?"

- "না, মানে, আপত্তি না থাকলে বাকি পথটা আমি সঙ্গে যেতাম। আরো কিছু প্রশ্ন জাগছে মনে। তাই আর কি..."

- "ও। কথা বলতে চাও। ঠিক আছে, চলো, ওই বেঞ্চটায় গিয়ে বসি।"

গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পার্কের ঘাসের ওপর পাতা বেঞ্চে যখন আমরা বসলাম, চারপাশে অন্ধকার নেমেছে। দূরে পার্কের চৌহদ্দির বাইরে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আর বাড়ীগুলোয় জ্বলে উঠেছে আলো। সেদিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধান্বিত স্বরে বলেই ফেললাম আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকা প্রশ্নটা – "আচ্ছা, আপনার এই তিন পোষ্য কি কোনদিন কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিল? যার ফলে তাদের এই অবস্থা?"

- "হুম। আগেও অনেকে জানতে চেয়েছে এটা। উত্তর হল, হ্যাঁ এবং না।"

- "মানে?"

- "এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে এই রাস্তাটা হাইওয়েতে ওঠার ঠিক আগে একটা হিউমেন সোসাইটি সেফ হেভেন আছে। চোখে পড়েছে?"

- "ও, আচ্ছা, খেয়াল করিনি তো!"

- "আমার বাড়ীর পেছনের ছোট্ট ঘাসজমিটায় একটা তারের খাঁচা বানিয়ে তাতে দুটো ফেজ্যান্ট পুষেছিলাম। একটা লাল, একটা হলুদ। ফেজ্যান্ট জানো তো?"

- "হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ দেখতে হয় পাখীগুলো। আপনার পাখীরও শখ আছে বুঝি?"

- "শখ মানে, ওই আর কি, আমি তো ফ্লোরিডায় বড় হয়েছি; ওখানে আমাদের বাড়ীর বাগানে আর আশপাশের বনে ময়ূর-

টয়ূর ঘুরে বেড়াত | তখন থেকেই ভাল লাগে | যাইহোক, একদিন দেখি কি – লাল ফেজ্যান্টটা নেই, চারপাশে তার ছেঁড়া পালক-টালক ছড়িয়ে আছে, আর খাঁচার তারের একটা দিক এত্তখানি ফাঁক করা | বুঝলাম এটা র‍্যাকুনের কাজ – রাতের অন্ধকারে এসে কম্মো সেরেছে | আমি চট করে কোনো ব্যাপারে রাগি না কিন্তু সেদিন এত রাগ হ'ল যে ভাবলাম আজ রাতেই ফাঁদ পেতে ধরে সাবাড় করব শয়তানটাকে | পাতলাম ফাঁদ | পরদিন সকালে দেখি একটা নয়, পুরো র‍্যাকুন পরিবার আটকা পড়েছে তাতে | তিনটের মধ্যে আবার একটা বাচ্চাও | হাতে গুলিভরা বন্দুক, কিন্তু ট্রিগারে কিছুতেই আঙুল ছোঁয়াতে পারলাম না, জানো?"

- "বাচ্চাটাকে দেখে মায়া হ'ল?"

- "সে তো হ'লই | তাছাড়া ভেবে দেখলাম ওরা তো ঠিক সেরকম কোনো অপরাধ করেনি | খিদে মেটাতে শিকার ধরে বেড়ানো ওদের স্বাভাবিক আচরণ | এই যে কয়েকদিন আগে আমার পুরনো গাড়ীটা বাড়ীর সামনে ফুটপাথের ধারে পার্ক করে রেখেছিলাম, রাতেরবেলা কে বা কারা এসে টায়ারগুলো ফাঁসিয়ে দিয়ে চলে গেল, র‍্যাকুনগুলো তো আর ওরকম নিছক ক্ষতি করার জন্য ক্ষতি করতে আসেনি | শেষে ঠিক করলাম ওদের ওই হিউমেন সোসাইটির শেল্টারেই দিয়ে আসি; এরপর যা করার ওখানকার লোকজন করবে | আমার এক বন্ধুর বড়সড় পিক-আপ ট্রাকে চাপিয়ে ওদের ওখানে দিতে গেছি, কাগজপত্র সই করছি, দেখি হিয়াওয়াথা ন্যাশনাল পার্কের এক পার্ক-রেঞ্জার হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকল..."

- "হিয়াওয়াথা? সেটা কোথায়?"

- "সেকী, দুবছর আছ বললে এখানে, হিয়াওয়াথা ন্যাশনাল পার্ক চেনো না? প্রকৃতি-টকিতির ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই বোধহয়? থাকলে একদিন দেখে এসো, বিশেষত এখন, এই শরৎকালের শুরুটায় | এখান থেকে বড়জোর আধঘন্টা লাগবে গাড়ীতে | হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সেই রেঞ্জার এসে ওখানকার কর্মীদের বলল এক্ষুণি একজন ভেটারিনারি ডাক্তার লাগবে, কারণ বাইরে দাঁড় করানো জিপে যে আছে তার অবস্থা ভাল নয় | শুনে কৌতূহলে আমার কান খাড়া | ওদের পিছু পিছু গিয়ে দেখি জীপের মাঝখানের সীটটায় একগাদা রক্তমাখা কাপড়-টাপড়ের মধ্যে শোয়ানো রয়েছে একটা গোল্ডেন রিট্রিভার | নেতিয়ে পড়া চেহারা, দুচোখ বন্ধ, পিছনের একটা পা সাংঘাতিক জখম, এছাড়াও শরীরে চোট-আঘাত রয়েছে, কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে |"

- "সেই কি তবে আপনার এই গোল্ডরাশ?" আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করি |

- "ঠিকই ধরেছ, তবে সেই মুহূর্তে দেখে মনে হচ্ছিল না বাঁচানো যাবে | সঙ্গে সঙ্গে ওই বাড়ীর লাগোয়া ছোট্ট দু-কামরার ভেটারিনারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওকে | রেঞ্জারকে প্রশ্ন করে জানলাম – কারুর পোষা কুকুর, সাংঘাতিক কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছে, মনে হচ্ছে গাড়ীর চাকা বা ঐরকম ভারী কিছু পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে | এরকম হলে তো যা-ই করতে যাবে তাতেই বেশ খরচ | ভেটারিনারিয়ানের চেম্বারে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেও গাঁটের কড়ি খসবে | ইউথেনাইজ, মানে মানবিকভাবে মেরে ফেলতে গেলেও নিখরচায় হবে না | তাই বোধহয় যাদের কুকুর তারা ঝামেলা এড়াতে হিয়াওয়াথার বনজঙ্গলের ধারে ফেলে দিয়ে গেছে!"

- "ইস, কী দয়ামায়াহীন হয় কেউ কেউ!" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা |

- "তা হয়, তবে এক্ষেত্রে সেটা ছাড়াও আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নটা হেলাফেলার নয় | যখন নিজেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে তখন এরকম ঘটনা হঠাৎ করে সামলানো সোজা নয় | আর এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ঠিক কী করতে হয়, সেটাই বা কজন জানে? আমি অনেক বছর বর্ডার পেট্রোলের কেনাইন ইউনিটে কাজ করেছি, তাই অভিজ্ঞতা আছে |"

- "তারপর কী হ'ল?"

- "কুকুর বাঁচল, কিন্তু ওর পিছনের পা-টা বাঁচানো গেল না | আমি জীবনে জখম জন্তুজানোয়ার কম দেখিনি, কিন্তু সেদিন ওখানে দাঁড়িয়ে কী যে হ'ল, কিছুতেই চলে আসতে পারলাম না | যতক্ষণ ধরে ওর সার্জারি হ'ল, আমি বসে রইলাম ক্লিনিকের বাইরে | আর শেষ হওয়ার পর ডাক্তার যখন বেরিয়ে এসে বললেন অপারেশন সাকসেসফুল, ও বেঁচে আছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের কাউন্টারে গিয়ে ওকে পুষ্যি নেওয়ার আবেদন করে অ্যাডপশনের কাগজপত্র ওখানেই জমা দিয়ে দিলাম | সেই থেকে এ আমার কাছে | পাঁচ বছর হয়ে গেল | কী, তাই তো, হেই গোল্ডি?" বলে উনি সস্নেহে গোল্ডরাশের মাথাটা ঝাঁকিয়ে

আদর করলেন | আর আমি গল্পে মজে গিয়ে সময়ের খেই হারিয়ে জানতে চাইলাম, "প্রিন্সেরও কি এরকম কোনো কাহিনী আছে?"

- "প্রিন্স?" বলে একটু যেন থমকালেন উনি | তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনতে চাও? সময় আছে?" রাতের অন্ধকার ঘন হচ্ছে চারিদিকে | আরও ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে এখন | সেই শুনশান পার্কে শুধু আমরা দুটি মানুষ আর তিনটি কুকুর | বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই |"

- "একটু আগে যে বললে না, কেউ কেউ একটু বেশী নিষ্ঠুর হয়? তার জলজ্যান্ত উদাহরণ এই প্রিন্সের ঘটনা | আমি তখন পাশের রাজ্য মিনেসোটায়, ক্যানাডার সীমান্তে ইমিগ্রেশন অফিসের কর্মচারী | একদিন দেখি টিভিতে, কাগজে – না, তখন সোশ্যাল মিডিয়ার এত রমরমা ছিল না – সর্বত্র বড় বড় করে খবর, মিনেসোটার ডুলুথে দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বেআইনীভাবে পাচারের অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে একটা লোক | প্রথমে তেমন আমল দিইনি, কারণ ক্যানাডা আর মেক্সিকো সীমান্তে ইমিগ্রেশন দপ্তরে কাজ করার সময় বেআইনী পাচারকারী অনেক দেখেছি | কিন্তু তারপর যা কানে এল, তাতে পরিষ্কার বুঝলাম এ মোটেই সাধারণ কেস নয় | ঠিক করলাম নিজে যাব একবার | গিয়ে যা দেখলাম, তা আমার কল্পনার বাইরে | মানুষ বড় বিচিত্র জীব, বুঝলে? অন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে যে কেউ কেউ এক ধরনের পৈশাচিক আনন্দ পায় তার অনেক উদাহরণ তো রয়েইছে | কিন্তু বিশ্বাস করো, নিরীহ পশুপাখীদের যন্ত্রণা দেওয়ার এরকম 'টর্চার সার্কাস' আমি জীবনে আর দুটো দেখিনি | শুধু তাই নয়, লোকটা এসব দেখিয়ে পয়সা নিত, জানো? বলতে গেলে আজও আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, মাথা ঠিক রাখতে পারি না | জঙ্গলে গিয়ে শিকার করা এক জিনিস – আর এ তো একেবারে..."

- "ছেড়ে দিন, থাক ওসব কথা |"

- "না না, পুরোটা না বললেও অন্ততঃ প্রিন্সের গল্পটা শোনাই | ডুলুথের শহরতলি ছাড়িয়ে আরও খানিকটা দূরে সেই বিশাল খামার বাড়ীতে ঢুকলে প্রথমে বোঝা যাবে না কী নারকীয় কান্ডকারখানা চলত সেখানে | বাড়ীর পেছনটায় একটা জলার ধারে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় খাঁচার পর খাঁচা | যেন একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা | তার একধারে আবার কাঠের গ্যালারী | স্থানীয় পুলিশের কাছে শুনলাম ওখানে বসেই লোকে টিকিট কেটে দেখত ডানাকাটা, উড়তে না পারা আফ্রিকান গ্রে প্যারট খাঁচার মধ্যে ছটফট করছে একটা ক্ষুধার্ত সিভেট ক্যাটের গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য | অথবা একই এনক্লোজারের মধ্যে বন্দী দুই পুরুষ চিতাবাঘের মরণবাঁচন লড়াই – লড়তে লড়তে ঝিমিয়ে গেলেই বাইরে থেকে গরম লোহার শিকের ছ্যাঁকা | কিংবা হিংস্র নেকড়ের তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকা একপাল খরগোশকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে যেতে বাধ্য করা, যাতে তারা পঙ্গু হয়ে যায় |"

- "অবিশ্বাস্য!"

- "আমিও বিশ্বাস করতাম না, যদি না ডুলুথের একটা অ্যানিম্যাল শেল্টারে গিয়ে দেখতাম এই সার্কাসের খেলোয়াড়দের – সেই অসহায়, আধমরা জীবগুলোকে | তো সেইখানেই একটা ঘরে প্রিন্সকে প্রথম দেখি | পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভাঙা, মাথায় চোট, সামনের একটা পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা | ওর ওই চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না, জানো?"

- "এই এক ঘন্টায় আপনাকে যতটুকু জানলাম, তাতে সেটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে | তবে প্রিন্স-উপাখ্যান যা শুনলাম, তাতে আপনার কোলেরটির, মানে শ্যান্টালের কথা জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হচ্ছে না |"

- "ওর গল্প তুলনায় সোজাসাপ্টা | টেক্সাসের ব্রাউন্সভিলের কাছে মেক্সিকো সীমান্তে যখন বর্ডার পেট্রোলের কেনাইন ইউনিটের দায়িত্বে ছিলাম আমি; ও ছিল সেই ইউনিটে | নিয়মিত টহল দিতে বেরোত | একদিন একদল 'কায়োটি' মানে একটা বেআইনী শরণার্থী-পাচার চক্রের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ের সময় ওর মাথায় আর শিরদাঁড়ায় গুলি লাগে | যাই, এবার উঠতে হবে | এদের খাওয়ার সময় হ'ল | তোমার এসব ব্যাপারে আগ্রহ থাকলে একবার আমার বাড়ী চলেই এসো না | খুব দূরে নয় – ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি | সেখানে আমি আর আমার বোন যে অ্যানিম্যাল সেফ হাউসটা চালাই, দেখবে তাতে আরও এরকম কত আছে | শুধু কুকুর নয় – বেড়াল, পাখী, গিনিপিগ | সবারই এরকম কিছু না কিছু ইতিহাস রয়েছে |"

- "নিশ্চয়ই যাব | এরকম আবিষ্কার তো রোজ রোজ হয় না | তবে বিদায় নেওয়ার আগে একটা জিনিস খুব জানতে ইচ্ছে করছে – যদি কিছু মনে না করেন..."

- "লেট্ মি হিয়ার ইট।"
- "আপনি এসব করেন শুধুই কি একজন নরম মনের সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে, নাকি এর পিছনে অন্য কোনো প্রেরণাও..."

ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়লেন বেঞ্চে। আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে আস্তে আস্তে বাঁ'পায়ের প্যান্টটা গুটিয়ে তুললেন। সেই অন্ধকারেও হাঁটুর নীচ থেকে সাদা প্রস্থেটিক পা-টা ঝকঝক করে উঠল।

- "ইরাক যুদ্ধে হয়েছিল। আর্মিতে ছিলাম যখন। আই ই ডি।"

খুব ধীরে, নীচুস্বরে কথাগুলো ভেসে এল।

অন্ধকারের মোড়কে এক দীর্ঘদেহী মানুষ আর তিনটে কুকুরের সিল্যুয়েট মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। আর আমি বসে রইলাম সেই তারাভরা আকাশের নীচে; একা।

অভিনয়

অদিতি ঘোষদস্তিদার

- "মা! মা! হোয়াতে একটা দারুণ ভিডিও পাঠিয়েছি। খুলে দেখো, চমকে যাবে।"

মুন্নির ফোন। মেয়েটা একটুতেই উচ্ছ্বসিত হয়; মণিকার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। এখন জীবন সবেতেই নিস্তরঙ্গ। তবে এই সকাল আটটার সময় মেয়ের ফোন আসতে দেখে বুকটা একটু ধক করেই উঠেছিল; ফোনটা ধরতে ধরতেই মনে একরাশ কুচিন্তার ঝড়! মেয়ের খুশি উপছানো গলা শুনে স্বস্তি!

- "আচ্ছা আচ্ছা তোর তো সবেতেই চমকানি, কী এমন জিনিস পাঠিয়েছিস শুনি — নতুন কোনও গান গেয়েছিস?"
- "উফ্ মা, তুমি যে কী না! আমার গান শুনে কি তুমি এখন চমকাবে?"

থতমত খান মণিকা। সামলে উঠে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "কেন নয় শুনি? আজকাল তো তুই আর বেশি গাস না!"

অপরপক্ষ চুপচাপ দেখে আবার সামলান মণিকা, "ও বুঝেছি! দাদুভাই গেয়েছে তাই না? সারেগামা শেষ করে গান শুরু করিয়েছেন মাস্টারমশাই, তাই না?"

মুন্নির একটাই ছেলে। ক্লাস ফাইভে পড়ে। নাতি-গর্বে মণিকা ডগমগ!

- "ওহ্, মাগো মা! আমি আর বকতে পারি না তোমার সঙ্গে। তুমি যাও, খুলে দেখো এক্ষুনি...!"

মুন্নি ফোন করে রোজই, তবে রাতে ছেলে ঘুমোলে। সারাদিন অফিস, তারপর বাড়ি ফিরেই ছেলের পড়াশোনা আর হোমওয়ার্ক নিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ ফোন করেছে অফিস যাবার পথেই। মুন্নি এমন করে ফোন করার পরও মণিকার হোয়াটস্অ্যাপ খুলে ভিডিও দেখার ইচ্ছে হ'ল না। আসলে ফোনকে ফোনের মতো করে ব্যবহার করতেই ভালবাসেন মণিকা — যদিও মুন্নি সব শিখিয়ে দিয়েছে, বাংলায় টাইপ করা অবধি, তবুও বড় আলসেমি লাগে। ছোট স্ক্রিনে কিছু দেখতে একদম ভাল লাগে না। টেলিভিশনই পছন্দের জিনিস। মুন্নি অবশ্য টিভিতে ফোনের ভিডিও চালাতে পারে। টিভি স্মার্ট হলেও মণিকা নিজে এখনও অতটা দক্ষ হয়ে ওঠেননি। রিমোটের বোতাম টিপে চ্যানেল বদলানোতেই আটকে

আছেন।

'ধুস, দেখব এখন, কাজ সারি আগে। মেয়ের তো কান্ড, সবেতেই উত্তেজনা। হবে এখন। ওর তো আবার ফোন করতে করতে সেই রাত্তির দশটা, তার মধ্যে দেখে নেব!' মনে মনে এই ভেবে কিছুটা ঘরের বাসি কাজ সেরে মণিকা একটু বাজারের দিকে গেলেন। অলক চলে যাবার পর এখন একদম একা। মুন্নির বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। ছেলের চাকরিসূত্রে বিদেশেই স্থায়ী বসবাস।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়েসের তফাত ছিল ঠিকই, তবু যাবার বয়স তো অলকের হয়নি। বেশ কিছুদিন ভুগে সুস্থ হয়ে ওঠার মুখেই চলে গেলেন ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে।

বাজারে টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে লন্ড্রি থেকে কাচানো কাপড়গুলো আনতে গেলেন মণিকা। মুন্নির ভাল জামাকাপড়, শাড়ি সব এ পাড়ার লন্ড্রিতেই কাচানো, পালিশ করা হয়। আসলে বিয়ের আগের থেকেই অভ্যাস। মণিকা এনে গুছিয়ে রেখে দেন, ও সময়মতো এসে নিয়ে যায়।

বাজার আর টুকিটাকি কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। রান্না করা খাবার ফ্রিজে ছিল। সন্ধ্যেবেলা একটি মেয়ে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। মণিকা রাঁধুনি রাখতে আপত্তি করেছিলেন, মুন্নি শোনেনি। তবে বাজার দোকান মণিকা নিজেই করেন। মেয়ে জামাই এলে ভালমন্দ রান্নাও।

খেয়ে উঠে কাগজ পড়তে পড়তে একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। চমকে উঠলেন কলিং বেলের আওয়াজে। চারটে বাজে সবে। এসময় কে এল?

- "তুই? কী হয়েছে?"

- "হয়েছে আমার মাথা। নিশ্চয়ই তুমি হোয়া খুলে দেখোনি!" মণিকা ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেললেন।

- "হেসো না। রাগ ধরে। যদি তুমি দেখতে ঠিক আমায় মেসেজ করতে। যাকগে, ভালই হয়েছে, চলো দেখবে আমার সঙ্গে।"

- "ভাল তো হয়েইছে, এরকম হঠাৎ করে তুই এলি! কী যে ভাল লাগছে। চা খাবি তো?"

- "না, আমি কফি খেয়ে এসেছি বেরোবার সময়, তুমি আগে দেখবে এসো।"

মণিকা এইবার একটু ধন্দে পড়লেন। মেয়েটার কোন কিছুতে তর সয় না এটা ঠিকই, কিন্তু অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে মাকে ভিডিও দেখাতে আসবে এটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। মুখে অবশ্য কিছু বললেন না। জীবনে চলার পথে সঞ্চয় বলতে যা জমেছে তা হচ্ছে অসীম ধৈর্য।

মাকে সোফায় বসিয়ে নিজে পাশে বসল মুন্নি। তারপর নিজের ফোনটা খুলে হোয়ায় পাঠানো ভিডিওটা চালাল টিভিতে। ইউটিউবে বিজ্ঞাপনের পর টিভির পর্দা জুড়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে টেলিফিল্ম। নামটা দেখেই মণিকার মনে পড়ে যায় পুরনো কথা!

- "এটা কী রে? এটাই কি সেই নাটকটা... অসুখের আগে তোর বাবা... তুইই বলেছিলি বোধহয়..."

- "আরে, দেখো তো!"

চিরকালই অলক ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির। মণিকা চিরকাল ভয়ে ভয়েই সংসার করেছেন। বিয়ে হয়ে এসে ইস্তক দেখছেন পরিবারের সবাই অলককে সমঝে চলে। ননদ, দেওররা তো বটেই, এমনকি শাশুড়িও। ছেলেও বাবাকে এড়িয়েই চলত। একটু আধটু কথাবার্তা যা হতো, মুন্নির সঙ্গে।

চিরকাল সংসারে টাকা ফেলে দেওয়া ছাড়া অলক তেমন কিছু দেখেননি। পরিবারের সব ঝামেলা-ঝক্কি সামলাতে হয়েছে মণিকাকেই। কম-বয়সী মেয়েটা কবে পাকা গিন্নি হয়ে গিয়েছিল, সেটা আজ আর মনে পড়ে না।

কথাবার্তা খুব কম বলতেন অলক। যেটুকু দরকার সেটুকুই। ঘরকুনো মানুষ ছিলেন। এতগুলো দিন সংসার করেও একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেছেন বা সিনেমায় গেছেন এমন স্মৃতি মণিকার নেই। যা কিছু শখ আহ্লাদ মিটিয়েছে ননদ দেওররা, পরে ছেলে মেয়ে।

অফিস ছাড়া আর একটা ব্যাপারেই উৎসাহ ছিল অলকের। অভিনয়। তবে অফিস ক্লাবেই। নাটক, যাত্রা সবেতেই ছোট বড় পার্ট করতেন। মণিকা দেখেছিলেন দু'একটা বিয়ের পর পর। তারপর ছেলেমেয়েরা এল। সারাদিন অফিসের পর নাটকের রিহার্সাল করে অলকের বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। সংসারের সবটা সামলে মণিকার আর উৎসাহ ছিল না স্বামীর অভিনয় দেখার।

রিটায়ারমেন্টের পর নাটকের নেশা আরও বেড়ে গিয়েছিল অলকের; অবশ্য বেশিদিন তো কাটালেন না অবসর জীবন! বছর তিনেকের মধ্যেই সব শেষ।

একবার মণিকা বোধহয় মুন্নির মুখেই শুনেছিলেন, কী একটা

টেলিফিল্মে কথা হচ্ছে অলকের অভিনয়ের | সেটার যে শুটিং কমপ্লিট হয়েছিল সেটা একেবারেই জানা ছিল না | বোধহয় মুন্নিরও নয় | তাই আজ হঠাৎ করেই ইউটিউবে নজর পড়তেই আবেগ আর বাঁধ মানেনি |

অলক চলে গেছেন ছয়মাস হ'ল | সেই মানুষটাকে চোখের সামনে আবার ঘোরাফেরা করতে দেখে মণিকার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল | এরকম তো কতই হয়, কত অভিনেতা, গায়ক চলে গেছেন, তাঁদের তো নিয়মিত দেখেন টিভির পর্দায়! কিন্তু আকস্মিক নিজের ঘরের লোককে এমন জীবন্ত দেখে মণিকার চোখের জল আর বাঁধ মানল না! মুন্নিরও চোখে জল!

- "ভালই হয়েছে, তুমি খোলোনি ভিডিওটা! মেট্রোয় ফোন ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভিডিওটা পেয়েই এমন আনন্দ হ'ল যে আগুপিছু কিছু না ভেবেই পাঠিয়ে দিলাম তোমাকে! অফিসে কাজের ফাঁকে হঠাৎ মনে হ'ল কাজটা ঠিক হয়নি | তবে তোমার কোন প্রতিক্রিয়া যখন পেলাম না, বুঝলাম তুমি এখনও দেখোনি! তাই চলে এলাম |" মায়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মুন্নি বলল |

নাটকের প্রথমে দু'একটা সিনের অনেকটা পরে শেষের দিকে আবার অলকের কিছুটা অভিনয় | সেই সিনটা দেখতে দেখতে মণিকা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা মুন্নি, এক রকম দেখতে দুটো লোক হয়, তাই না রে?"

- "হ্যাঁ, তা তো হয়! কেন বলো তো?"

- "এ তোর বাবা নয় |"

- "কী যে বলো মা! বাবাকে চিনতে পারব না? একদম শেষে নামও আছে | আর বাবা এই টেলিফিল্মের নামই তো আমাকে বলেছিল, তুমিও তো জানতে | তোমাকে বলেছিলাম তো!"

মায়ের প্রশ্নে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে একরাশ কথা বলে ফেলে মায়ের মুখের দিকে তাকায় মুন্নি |

মণিকার মুখে এখন এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততা | খানিক আগের সেই আবেগের লেশমাত্র কোথাও নেই |

- "কী গো! তোমার সন্দেহ হচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়াও, ভিডিওটা ফরওয়ার্ড করে নাম দেখাচ্ছি তোমায় |"

মুন্নি মাকে বিশ্বাস করাতে তৎপর হয়ে ওঠে |

- "এ তোর বাবা হতেই পারে না | কক্ষনো নয়!" দৃঢ় গলা মণিকার | "তোর বাবা কি কখনও এমনি করে প্রাণখোলা হাসি হাসতে জানত!"

- "উফ্, মা! এটা তো অভিনয় |"

মণিকা উদাসভাবে উত্তর দিলেন, "কোনটা?"

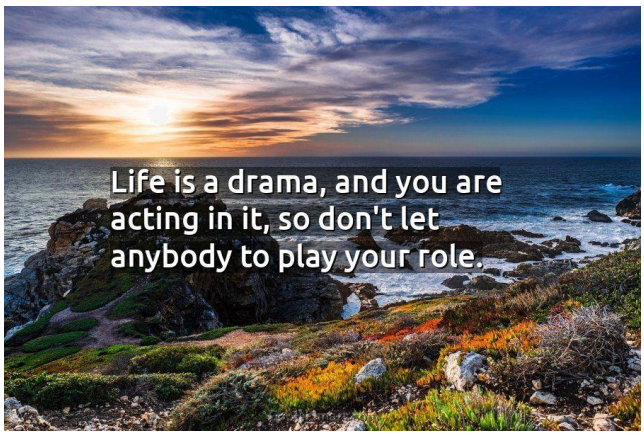

পাজামা বনাম নাইটি

বলাকা ঘোষাল

ছোটবেলায় আমার ঠাকুমার একটা ধাঁধা ছিল, "মাথা নেই তার, তবু মানুষ পেলেই গেলে।" কল্পনা হাতড়িয়েও কূল পেতাম না এর অর্থ। কীই বা হতে পারে! ভাবতাম অ্যানাকোন্ডার মতন ব্যস, সবাইকে করে নেয় গ্রাস, সেটা কী জন্তু! উত্তর ছিল – জামা। এই যুগে নাইটিই হবে সঠিক উত্তর।

এই তো কদিন আগে আমার এক বান্ধবীর কলকাতায় "ম্যাক্সি" কিনতে গিয়ে নাকাল হবার গল্প শুনলুম। সাধারণ একখানা কাপড়ের সিলিন্ডার, যাতে মাথাটা কোনমতে গলিয়ে দিলেই আগাগোড়া সবটা ঢেকে গিয়েও ভর-গরমে হাওয়া খেলতে থাকে। সেই বস্তুটি কিনতে গিয়েও হয়রানি!
খামোখা ম্যাক্সি শব্দটা বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল কেন আমাদের শব্দকোষ থেকে! সে এক রহস্যই বটে। ম্যাক্সি ছিল মেমের জামা, গাউনের মাসতুতো বোন। মোমের পুতুল, মেম সেজেগুজে আলখাল্লার মতন গাউন পরে সারা শহর ঘুরে আসতে পারত; সেটাই কিনা হঠাৎ হয়ে গেল সাধারণ গৃহবধূদের সারাদিনের পোশাক? আগে যা ছিল কলার দেওয়া, ফোলানো ঘটি-হাতা, কোমরে কুঁচিওয়ালা, গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা জামা; তা এখন নিদেন পক্ষে আলখাল্লা বা জোব্বার স্টেটাসও পেল না, যেটা পরে পথেঘাটে বেরিয়ে পড়া যায়। বোরখার মতন আপাদমস্তক না হোক, আপাদস্কন্ধ তো বটে! ফটফটে দিনের বেলাতেও যে জামা পরে থাকা যায়, তার নাম হয়ে গেল 'নাইটি'!

বছর পঞ্চাশেক আগে, উচ্চবিত্তদের উঁচু নাক আরও সিঁটকে গেল। ফ্যাশনের দৃষ্টিকোণ থেকে নাইটির মান নাকি অতি নীচে। কোথায় পূর্ণিমার চাঁদ, আর কোথায় কেরোসিন শিখা! কোথায় ময়ূর আর কোথায় কাক! নাইটি পরিহিতা রমণীরা পালক গুঁজে উপরতলার বাসিন্দা হতে চাইছে ভেবে তাদের আরও আপত্তি। আর উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও মেয়েছেলেদের এহেন ছিরিছাঁদহীন মেম-নকল-করা জোব্বা পরা ছিল বেশ লজ্জার। তার উপর 'নাইটি' নামকরণে পোশাকটি নাকি এক্কেবারে জাত খুইয়ে 'ছিছি' গোত্রে পড়ে গেছে। বাড়ির মেয়েদের এই পোশাক বাড়িতেও পরতে দিতে তাঁরা এক্কেবারে নিমরাজি।

বলি ব্যাপারটা কী? গাউন থেকে এত ডাউন হয়ে গেল কী করে এই জামার মান? লম্বায় গাউনের ঢঙ্গে হলেও, প্রস্থে জাত গেছে। আগাগোড়া বিশ্রী রকমের ঢোল-কম্পানি। মাপের বালাই নেই – কাঁধ ৪৬, ছাতি ৪৬, কোমর ৪৬, নিতম্ব ৪৬ – যাকে বলে ইউনিভার্সাল। অর্থাৎ ওয়ান-সাইজ-ফিটস্-অল – রোগা, মোটা, ছুঁড়ি-বুড়ি সবাই গলে যেতে পারে অনায়াসে। দেখতে যেমনই হোক, এর একটা সুবিধে অবশ্যই আছে। গিন্নীর বান্ধবী, আত্মীয় যে কেউ দিন কাটাতে এলে তাকে নাইটি পরতে দেওয়া যেতে পারে। ঘটমের মতন ভুঁড়ি নিয়েও দিব্যি সেঁধিয়ে যাওয়া যায় নাইটিতে। কাউকে অস্বস্তিতে পড়তে হয় না। ঘাড় থেকে গোড়ালি সব এক মাপ। শুয়োরদেরও এই সুনাম আছে, তবে সেটা নেহাতই কাকতালীয়।

স্বাধীনতার পরে বিদেশী পোশাক যদি আমাদের মহিলাদের আলমারি কব্জা করে নিয়ে থাকে, এটা তবে ব্রিটিশদের একটা চোরা প্রতিশোধ বলতে হবে! শাড়ি এখন কেবল ফ্যাশনের জন্য কেনা হয়, আটপৌরে শাড়ি বলে নাকি আর কিছু নেই। এমনকি বন্যা ত্রাণের জন্যও শাড়ি নিতে রাজি নয় ত্রাণ-সংস্থাগুলো। নাইটিই সহজ আচ্ছাদন।

পোশাকের মাধ্যমে যদি পাশ্চাত্য দেশ গোটা বিশ্বকে দখলে আনার স্বপ্ন দেখে থাকে, তাহলে ভারতের কাছে হেরে গেছে তারা। পাল্টা আক্রমণে বিশ্বজয় করেছে পরাক্রমী ভারতীয় পোশাক – 'পাজামা'। টেক্সটাইল শিল্পে পাজামা পেল আন্তর্জাতিক সম্মান। জাপান থেকে আমেরিকার আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাকে বানিয়ে ফেলল নাইট-ওয়্যার। তার উপর আবার আদর করে ডাক নাম দিল 'জ্যামি'। আর পাজামা কেবল পা আচ্ছাদন করেই ক্ষান্ত হয়নি, শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ ঢাকা 'গা-জামা'-সহ গোটা নাইট-স্যুটের মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে নিজেকে। এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে রাত-ভোর-করা গুলতানির নাম হয়ে গেল 'পাজামা পার্টি'। অথচ বাঙালি মহিলাদের দুপুরে পরচর্চার ফিসফিসানিকে 'নাইটি-পার্টি' বলতে তো শোনা যায় না!

নাইটির সঙ্গে পাজামার অনেক তফাৎ, সন্দেহ নেই। তার কয়েকটা এখানে না বললেই নয়। হাওয়া খেলানো কাপড়ের সিলিন্ডারের কাছে চোঙা-মার্কা পাজামা অনেকটা

খোলা পার্কের পাশে জেলখানার মতন | যতই শোভন বলো, কেমন যেন বাধো বাধো লাগে হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবানদের | পাজামা নাকি এক্সক্লুসিভও হয়, যাকে বলে 'টেইলার-মেড'| আরেক দিকে পাইকারি দরে স্মল, মিডিয়াম, লার্জ, এক্সট্রা লার্জ, এক্স এক্স এল-এ ছেয়ে গেছে বাজার | কেউ একটা পরলেই হ'ল | এমন কোন ব্যাপার নয় যে গায়ের মাপের সঙ্গে মিলতেই হবে | আর পাজামা নামটা, মানতেই হবে যে বড় গেঁয়োমার্কা – আন্তর্জাতিক বাজারে এক্কেবারে পাতে দেবার মতন নয় | 'পা-জামা' । নাইটিতে তাও একটা বিলিতি গন্ধ আছে | 'নাইটি' | ওই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নামের সঙ্গে মিল | গুণে না হলেও, বঙ্গনারীরা ফ্লোরেন্সদিদির অন্তত পদবীটির একটি খন্ড গায়ে তো জড়িয়ে নিয়েছেন! সেই বা কম কী? ভগিনী নিবেদিতার সাথে অন্তত পোশাকের মিলটুকু থাক, মাদার টেরেসার মতন করে শাড়ি পরা নাই বা হ'ল |

খেতে বসে পাজামার মতো নাইটি কোমরের চামড়ায় কামড়ে বসে না | ভুরিভোজ খেতে খেতে পাজামার দড়ি আলগা করে যাঁরা পরম তৃপ্তিতে খেতে থাকেন, তাঁদের নানাভাবে অপ্রস্তুত হবার অভিজ্ঞতার গল্প শুনে হাসতে হাসতে কোমরের দড়িটাই ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয় | ওই দড়ি হ'ল পাজামার আরেক ঝামেলা | দড়ি ভরা না থাকলে পাজামা পরা যাবে না | পাজামার দড়ি ছোট হলে মুশকিল, বেশী বড় হলে সামলানো ঝামেলা – এতেও নানাভাবে অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনা থাকে | আর গিট্ঠু লেগে গেলে তো কথাই নেই – সাধে কি বলে "কী গেরো"? দড়ির সমস্যা এড়াতে ইলাস্টিকের উদ্ভব হয়েও দুরকম সমস্যা – খুব আঁটো হলে দম বন্ধ হবার জোগাড়, আর ঢিলে হলে যে কী ব্যাপক ঝামেলা সে কেবল ভুক্তভুগীরাই জানে | আর জিপার বা বোতামওয়ালা হলে তো প্যান্ট পরলেই হতো | সুতরাং পাজামত্বর ওখানেই ইতি | নাইটির বাপু দড়ি-বোতামের মাথাব্যথা নেই | ওই কাপড়ের টানেলে ঢুকে গেলেই হ'ল |

অবশ্য বেলা শেষে নাইটিরও শিকে ছিঁড়েছে এখন | আজকাল ফ্রক, গাউন, ম্যাক্সি যে নামেই ডাকা হোক, সে আবার তার হারানো আসন খুঁজে পেয়েছে বঙ্গসমাজে | এখন পথেঘাটে দেখা যায় নানা বয়সের মেয়েরা (থুড়ি, ম্যাডাম) দিব্যি কায়দার জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন | দৈর্ঘ্য হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি অবধি গেলেই হ'ল | জয় মা! দুর্গা প্রতিমারও হয়তো একদিন শখ হবে ফ্রক পরতে! নাইটি নিয়ে সমাজের উঁচুস্তরেও আর নাক সিঁটকানো নেই | আর্থিক বা শিক্ষাদীক্ষার মাপকাঠি নির্বিশেষে সবাই রাজি বাড়িতে দিনের বেলায় নাইটি পরিধানে, আর নিদেনপক্ষে ওটারই কোমরে কেতাদুরস্ত বেল্ট বেঁধে পার্টি-ওয়্যার হয়ে উঠেছে!

যাক, এসব বৈষম্য তো অনেক হ'ল | এক জায়গায় কিন্তু এই দুই পোশাকই মানুষকে করেছে ঐক্যবদ্ধ | 'ওয়ার্ড্রোব অ্যাম্বাসাডার অফ্ গ্লোবাল পীস্' বলা যেতে পারে | নাইটি ভারতের নারীজাতিকে সংঘবদ্ধ করেছে জাতি, ধর্ম, বয়স, আয়তন নির্বিশেষে | আর পাজামা জয় করেছে সারা বিশ্বকে | এই দুই পোশাকই প্যান্ডেমিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় পোশাক হিসেবে মদ্দ, বুড়ো, ছোঁড়াছুঁড়ি, এলজিবিটিকিউ -দেরও অফিস করিয়েছে মাসের পর মাস ধরে |

পাজামার ক্লোজ-কাজিনরাও কেউ পিছিয়ে নেই | প্যালাজো, লেগিং, ইয়োগা প্যান্টও জ্যামির গোত্রে স্থান পেয়েছে | কর্ম জগৎ আর কোনদিনও প্যান্ডেমিকের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না | বাজারের ফল-সবজির মতন চাকরিও এখন হাইব্রিড | তাই বেঁচে থাক আমাদের নাইটি-পাজামা জুড়ি |

আত্মগরিমা

সুজাতা দাস

মধুবন্তী যখন বিয়ের আসরের দিকে যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ তার ছোট বোন মাধুরী এসে বলল, "দিদি, নিচে ছেলের বাবা সবার সামনে বাবাকে পণের টাকার জন্য আজেবাজে কথা বলছেন। উনি বলছেন ছেলেকে তুলে নিয়ে যাবেন, যদি পণের টাকা না পান বিয়ের আগে। কোনো কাকুতি মিনতির ধার ধারছেন না ভদ্রলোক। সবার সামনেই অপমান করছেন বাবাকে বাজেভাবে।"

মাধুরীর বলা কথাগুলো তীরের মতো বিঁধছিল মধুবন্তীর কানে। কোনও বাধা না মেনে চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসছিল গাল বেয়ে।

যে মেয়েটি সাজাচ্ছিল, সে হঠাৎ চেঁচিয়ে মাধুরীকে বলল, "এখান থেকে যাবি মাধু? তোকে কে পাকামো করতে বলেছে শুনি! যা নিচে যা। বড়রা আছেন তো ওখানে, সব বুঝে নেবেন তাঁরাই।"

বকা খেয়ে মাধুরী মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই, মেয়েটি মধুবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওসব নিয়ে তুমি ভেবো না মধুদি। বড়রা আছেন তো, না কি? সব ঠিকই হবে, দিলে তো সব সাজানো খারাপ করে!"

কিন্তু মধুবন্তীর এইসব কথা শোনার পর কান্না থামছিল না কিছুতেই। সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "কেন মেয়ে হয়ে জন্মাই বল তো আমরা, মালবিকা? আমাদের জন্য বাবা মায়ের কেন নিস্তার নেই মলি।"

মালবিকা মধুবন্তীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শুধু, কারণ ততক্ষণে মালবিকার গালেও দেখা দিয়েছে জলের রেখা। মধুবন্তী তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ মালবিকার দিকে। হঠাৎই সব ছবির মতো মনে পড়তে থাকল তার। আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে নিল মধুবন্তী; তারপর বলল, "আমি ভুলে গেছিলাম মলি, সব হাসির পিছনেই যে কান্না লুকিয়ে থাকে; এই কথাটা কীভাবে ভুলে গেলাম আমি! সত্যিই মলি, মেয়ের জন্ম দিয়ে বাবা মা খুব অসহায় হয়ে পড়েন আজকের যুগেও।"

মধুবন্তীর কথাগুলো শুনতে শুনতে হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে নিল মালবিকা। মুখে বলল, "তুমি গালটা বাড়িয়ে দাও দেখি মধুদি, পরানো চন্দন যে পুরো নষ্ট হয়ে গেছে।"

গালটা বাড়িয়ে দিলেও মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল মধুবন্তীকে। বকা খেয়ে মাধুরী নিচে চলে গেলেও ওর বলা কথাগুলো বাজছিল দ্রীম দ্রীম শব্দে মধুবন্তীর কানে – "দিদি, বাবাকে ছেলের বাড়ির লোকেরা পনেরো টাকার জন্য অপমান করছেন... দিদি শুনছিস, শুনছিস দিদি, শুনছিস শুনছিস শুনছিস? দিদি তুই শুনতে পাচ্ছিস?..."

আনমনেই কানে হাত চাপা দিল মধুবন্তী; তারপর খুব আস্তে বলল, "আর কত মলি? আর কতদিন মেয়ের বাবারা অপমানিত হবেন এভাবে?"

মধুবন্তীর পেতে দেওয়া গালে কল্কা আঁকতে আঁকতে মালবিকাও ফিরে যাচ্ছিল কয়েক বছর আগের একটা বিয়ের মন্ডপের দিকে – বিয়ের আনন্দে মশগুল একটা মেয়ে, দুই হাতে পান দিয়ে চোখ ঢেকে পিঁড়িতে বসতে না বসতেই, শুনতে পাচ্ছিল ছাদনাতলা থেকে একটা শোরগোলের আওয়াজ। কিন্তু বিয়ের আনন্দ সেদিকে মন দিতে দেয়নি সেদিন মেয়েটিকে। বিক্রমকে সে ছবিতে দেখেছিল মাত্র, বিক্রমের পুরুষালি চেহারা তাকে আকৃষ্ট করেছিল। মনে মনে তাই মত দিতে দেরি করেনি। বিক্রমের মতো একজন এঞ্জিনিয়ার শহুরে ছেলে তার স্বামী হতে যাচ্ছে, এটা ভেবে একটু অহংকারীও হয়ে উঠেছিল হয়তো মেয়েটি। তাই হয়তো সেই তর্কবিতর্কের শব্দগুলো তার কান অবধি পৌঁছাতেই পারেনি। ভাবে বিভোর হয়ে পিঁড়িতে চড়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে মন্ডপের দিকে যাচ্ছিল মাথা নিচু করে, হঠাৎ একটা বুকফাটা চিৎকার কানে আসতেই চমকে পানপাতা সরিয়ে নিল মেয়েটি। আর তখনই সে দেখল তার বাবা বিক্রমের বাবার পায়ে মাথা ঠুকছেন আর বলছেন, "বিয়েটা হতে দিন বেয়াইমশাই, আমি আমার কথা ঠিক পূরণ করব, এর অন্যথা হবে না। বেয়াইমশাই, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, এক বছরের মধ্যেই সবকিছু মিটিয়ে দেব, যা যা বাকি রইল দেওয়ার..."

কিন্তু ভদ্রলোক কোনও কথাই তো শুনছেন না, উল্টে যা নয় তাই কথা শোনাচ্ছেন মেয়েটির বাবাকে। এই ঘটনায় যতটা না অবাক হচ্ছিল মেয়েটি, তার চতুর্গুণ অবাক হ'ল বিক্রমের অভিব্যক্তি দেখে! অবাক হয়ে দেখছিল বিক্রম তার বাবার কথামতো মন্ডপ ছেড়ে গাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন

সম্বিত ফিরল মেয়েটির | যারা তার পিঁড়ি ধরেছিল, তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে নামিয়ে দাও মণিদা, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে; আমাকে নামাও |"

যারা পিঁড়ি ধরেছিল তারাও এতক্ষণ স্থবির হয়ে দেখছিল এসব | মেয়েটির কথায় তাকে নামিয়ে দিল মাটিতে | তারপর বলল, "দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা – বিয়ে না করে এখান থেকে যাওয়াচ্ছি সবকটাকে |" বলেই মণিলাল আর বাকি ছেলেরা ছুটেছিল ছেলেকে ধরে আনতে | ততক্ষণে পিঁড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে, খুব ঠান্ডা মাথায় হেঁটে একদম বাবার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি | তারপর নিচু হয়ে বাবাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল | নিজের হাতে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, "বাবা, তুমি একদমই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নও | তুমি আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে, মানুষের মতো মানুষ করেছ | আর সেই আমাকে যে তুমি এদের মতো অমানুষের হাতে তুলে দিচ্ছ এটাই অনেক বেশি |"

আচমকা মেয়েকে এখানে দেখে, আর তার মুখে এসব কথা শুনে বিভ্রান্ত মেয়ের বাবাও |

- "কী বলছিস মা তুই? অবাক হয়ে বললেন পরাণবাবু তাঁর মেয়েকে | "মেয়ে যে পরের ঘরেই দেবার জন্য মা!"

- "না বাবা, ওদের মতো লোকদের হাতে তোমার মেয়েকে তুলে দিয়ে তুমি ওদের দয়া করছ, সুতরাং তুমি মাথা উঁচু করে থাকবে |"

বাপ মেয়ের কথোপকথনের মাঝে পড়ে বিক্রমের বাবা এতটাই অবাক হচ্ছিলেন যে তিনি নিজেও ভুলে গেলেন তিনি ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন | মনে মনে ভাবছিলেন, কোথায় ওঁর পায়ে লুটোপুটি খাবে মেয়েটি; তা নয়, এখন তো উল্টো ঘটছে সবকিছু |

বাবাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এবার এগিয়ে গেল মেয়েটি বিক্রমের বাবার সামনে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল | তারপর ধরে আনা বিক্রমের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল মেয়েটি | দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "কাকাবাবু, আপনারা ফেরৎই যান, ওটাই ঠিক হবে আপনাদের জন্য |"

এসব কর্মকান্ডে বিস্মিত বিক্রমের বাবা মুখ ফসকে বলেই ফেললেন, "কেন?"

কথাটা শুনে মেয়েটি হাসল একটু | তারপর বলল, "যে ছেলের এখনও নিজের অভিমত জানানোর ক্ষমতা হয়নি, সে আপনার ছেলে হতে পারে কিন্তু আমার স্বামী হবার যোগ্যতা তার নেই |"

এই কথা শুনে ছেলে আর তাদের সাথে আসা বরযাত্রীদের নিয়ে বিক্রমের বাবা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন |

মেয়েটির বাবা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন সেই দৃশ্য দেখে | মেয়ে যে আমার লগ্নভ্রষ্টা হয়ে গেল! 'এই মেয়েকে কে বিয়ে করবে' বলতে বলতে বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকলেন পরাণবাবু | ততক্ষণে মেয়েটি ফিরে গেছে নিজের ঘরে | মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে নিজের পায়ে সে দাঁড়াবেই, দেখিয়ে দেবে সবাইকে যে মেয়েরা মোটেই দয়ার পাত্র নয় |

টপ করে গালের উপরে জলের একটা ফোঁটা পড়ায় চমকে উঠল মধুবন্তী, চোখ খুলে তাকাল মলির দিকে তারপর বলল, "কাঁদছিস কেন মলি? তোর মতো মনের জোর ক'জনের থাকে বল? সেদিন ওরকম ঘটনা না ঘটলে তুই কি আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতিস? নাকি মণিদা তোর জন্য আজও অপেক্ষা করে থাকত, বল তো?"

কোনও উত্তর দিল না মালবিকা, শুধু একটু হাসল মনে মনে | তবে মধুবন্তীর ততক্ষণে খুঁজে পাওয়া হয়ে গেছে নিজের উত্তর, তাই মলির হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়াল বাবাকে এই অপমান থেকে বাঁচানোর জন্য |

এক টুকরো স্বপ্ন

অর্পিতা ঘোষ পালিত

১

- "ভাত খেতে দাও মা, খুব খিদে পেয়েছে।"

- "একটু আগে তো গুড়-মুড়ি খেলি, বিধানের সাথে আর একটু খেলা কর। এক্ষুণি তোর বাবা চাল নিয়ে চলে আসবে, তারপর গরম গরম ভাত খাবি।"

- "রোজ শুধু আলুর ঝোল দিয়ে ভাত খাই, আজ কিন্তু মাছভাত খাব। কতদিন মাছ খাইনি; বিধানের মা রোজ মাছ রান্না করে।"

- "খেলা বাদ দিয়ে তোর ওদের রান্নাঘরের দিকে মন থাকে নাকি?"

- "বিধানদের উঠোনে খেলি তো, তাই খেলতে খেলতে গন্ধ চলে আসে। ওরা রোজ মাছ খায়। আমার বাবা মাছ আনে না কেন মা?" উত্তরের অপেক্ষা না করে ছ'বছরের পিন্টু দৌড়ে বিধানের সন্ধানে গেল। পিন্টুর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে মালার চোখ ফেটে জল এল। কতদিন ছেলেটার মুখে মাছ তুলে দিতে পারে না! দু'বেলা দু'মুঠো ভাত কত কষ্ট করে জুটছে, মাছভাত খাওয়া তো অতীতের স্বপ্ন!

দু'বছর আগেও মালার সংসারে খুশি উথলে উঠত। ওর স্বামী, নন্দ মাঝে মধ্যে এটা সেটা কিনে এনে ঘর ভরাত। মালার বাবা তাঁতী, শাড়ি তৈরির সুতো কিনতে খেয়ায় নদী পার হয়ে এপারে আসত। সুতোর রঙ বাছাই করবে, আর একটু বেড়াতে পারবে বলে বাবার সাথে যাওয়ার বায়না ধরত মালা। মেয়ের আবদারে ওকে সাথে নিয়ে সুতো কিনতে আসত ওর বাবা। খেয়া পারাপার করতে করতেই সুপুরুষ নন্দ-মাঝির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল মালা। বাবার চোখের আড়ালে দুজনের মধ্যে চলত মুচকি হাসি। পরে তা গাঢ় প্রেমে পরিণত হয়েছিল। আট বছর আগে বাড়ির অমতে নন্দর সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিল মালা। নন্দর বাবা তিন পুরুষ ধরে নদীতে নৌকা বায়। তখন বাপ-বেটা মিলে খেয়া পারাপার করতে করতে দম ফেলার সময় পেত না। নদীর পাড় রাত ন'টা পর্যন্ত মুখর হয়ে থাকত।

মালার বাবা নন্দ-মাঝিকে জামাই হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। নন্দর বাবা মা-হারা ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলেছিল। হাতে সোনার কঙ্কন ও কানবালা দিয়ে বরণ করেছিল। পরে বউ খালি গলায় থাকে বলে পয়সা জমিয়ে একটা হারও বানিয়ে দিয়েছে। মালা এখনো সেগুলো পরে থাকে। এত অভাব অনটন সত্ত্বেও নন্দ সেগুলোতে হাত দেয়নি। তিন বছর আগে হঠাৎ মালার শ্বশুর মারা যায়। সংসার তখন ভর-ভরন্ত ছিল, তাঁকে আজকের এই দুর্দিন দেখে যেতে হয়নি। এখন যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে পুরনো ঐতিহ্য হেরে গেছে। নদীতে নতুন ব্রীজ হওয়াতে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে ঠিকই, কিন্তু নন্দর মতো ভূমিহীন মাঝির পরিবারের কপালে এসেছে চরম দুর্দিন।

- "গালে হাত দিয়ে বসে কী অত ভাবছ? কখন থেকে ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছি না।" নন্দ বলল।

- "ও-ও, তুমি এসে গেছ..."

- "আজও তেমন লোকজন পারাপার করেনি। ক'টা মেটে আলু এনেছি, আলুর ঝোল আর ভাত রান্না করো। আজ হাটবার, দুটো খেয়েই তাড়াতাড়ি যাব, যদি নদীপাড়ে মানুষজন আসে..."

২

রাতে খাওয়ার পর দুজনে মাদুর পেতে মাটির দাওয়ায় বসে চাঁদের আলোয় একটু সুখ খুঁজে পাওয়ার আশায়। পিন্টু অনেক আগেই ঘুমিয়ে কাদা।

মালা নন্দর হাতটা কাছে টেনে বলল, "হাত পাতো।"

- "কেন, কী দেবে?"

- "পেতেই দেখো না, স্বপ্ন দেব।"

- "আমার আবার স্বপ্ন; যেদিন ব্রীজ চালু হয়েছে সেদিন থেকে সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। তারপর হাতের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে... হাতে এগুলো কী দিলে? এগুলো তো তোমার গয়না! এগুলো নিয়ে কী করব?"

- "আমাকে ক'দিন আগে তুমি বলেছিলে ব্রীজ তৈরি হওয়াতে মানুষজন আর তেমন নৌকায় চাপে না। অভাব অনটনের হাত থেকে রেহাই পেতে সুবলদা আর গোপালদা সেকেন্ড হ্যান্ড মাছ ধরার ট্রলার নৌকা পেয়েছে একটা, সেটা কিনবে ভাবছে। মোটামুটি সবকিছু ঠিক করে ফেলেছে ওরা। কিন্তু কিছু টাকা কম পড়ছে, তাই আর একজনকে খুঁজছে। ট্রলার কেনার পর মাছ ধরে বিক্রি করে যা লাভ হবে তা তিনজনের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হবে। তোমার কাছে এ-কথা শোনার পর থেকেই ভাবছিলাম... এবার এগুলো বিক্রি করে তুমি ওদের টাকা দাও,

তাহলে আমাদের নিজেদের মাছ ধরার ট্রলার হবে | ছেলেটা মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারবে | মাছভাত খাওয়ার জন্য রোজ যখন ও বায়না করে তখন আমার বুকের ভেতর কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে, কিন্তু ওর সামনে কাঁদতে পারি না |"

- "এই দু'বছরে ঘরের জিনিস, বাসনপত্র, বিক্রি করতে করতে আর কিছুই নেই | এগুলো আমি কিছুতেই নিতে পারব না, এগুলো বাবার স্মৃতি, বাবা তোমাকে দিয়েছে |"

- "আমরা তো কিছু নষ্ট করছি না, ব্যবসার কাজে লাগাচ্ছি | ওপর থেকে বাবা আমাদের এরকম দুর্দশা দেখে খুব কষ্ট পাচ্ছে, তুমি ট্রলার কিনলে বাবা খুব খুশি হবে | সবাই মিলে মাছ ধরবে, মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে আবার আগের মতো আমাদের সংসার ভরে উঠবে | তখন তুমি আবার গয়না তৈরি করে দিও |"

হাতে গয়নাগুলো নিয়ে নন্দ রাতের আকাশে কী যেন খুঁজতে লাগল | মনে হয় বাবার কাছে অনুমতি নেওয়ার জন্য বাবাকে খুঁজছে | আজ রাতের আকাশটা কেমন জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে | হঠাৎ একটা তারা জ্বলজ্বল করে উঠল; বাবার আশীর্বাদ পেয়েছে ভেবে নন্দর মুখ হাসিতে ভরে উঠল |

নন্দর হাসিমুখ দেখে মালার মনে খুশির ঢেউ খেলে গেল; দু'চোখে ভেসে উঠল পিন্টুর হাসিমুখ করে মাছভাত খাওয়ার দৃশ্য!

শ্রী নারায়ণ সাহেব

রুমকি দাশগুপ্ত

সালটা ১৯৭০ | কলকাতা তখন ঘটনাবহুল; অতি বৃষ্টি, বন্যা বাদেও এরই মধ্যে শ্রী নারায়ণ সাউয়ের কলকাতা বাসের বছর ঘুরে এল | বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়েছে তার | মা, বাবুর ইচ্ছা ওকে খানিকটা বাড়িতে পড়িয়ে নিয়ে, বয়সোচিত ক্লাসে ইস্কুলে ভর্তি করা | নিজেদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হলেও এর আগেও ওঁরা এমত কাজ করেছেন | নারাণের জন্য স্লেট, পেন্সিল, বর্ণপরিচয়, কেনা হয়েছে | সে এক-দুই শিখছে | খুব গর্ব করে সে তার দাদা, জগন্নাথকে বই, স্লেট ইত্যাদি দেখিয়েছে | সন্ধ্যেবেলায় দাদা দিদিরা পড়তে বসলে মা বসেন নারাণকে পড়াতে | নারাণের উচ্চৈঃস্বরে পড়ার আওয়াজে বাড়ি গমগম করে | নারাণ খুব তাড়াতাড়ি ক-এ আকার কা থেকে শুরু করে ক-এ বিসর্গ কঃ, ক-এ অনুস্বর অবধি শিখে ফেলেছে | দাদা দিদিদের সামনে নারাণের অধ্যবসায় উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয় | "ছাত্র হতে হয় এমন! তোমরা সুযোগ পেয়েও অবহেলা করো, আর ওকে দেখো, দেখে শেখো |"

প্রসঙ্গত বলে রাখি, ভাইটি কত্তাবাবুদের বাড়িতে পুরোপুরি ফিট হয়ে গেছে বুঝে জগন্নাথ একদিন ঠাকমাকে বলেই ফেলল, ভাইটি তার সবে দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দিয়েছে | অত ছোট জানলে যদি তাকে রাখা না হয়, তাই সে ভাইয়ের বয়স বাড়িয়ে বলেছিল |

যাই হোক, নারাণ ছোট ছোট শব্দ পড়তে শুরু করেছে – আম, জাম, রাম, ইত্যাদি | মা বলেছেন বানান মুখস্থ করতে; লিখতে দিলে বানান ঠিক হওয়া চাই | নারাণ গমগম করে পড়ে বানান মুখস্থ করল কয়েকদিন ধরে | আজ বানান পরীক্ষার দিন | স্লেট পেন্সিল হাতে নারাণ | মা এক এক করে শব্দ বলছেন আর নারাণ ফটাফট লিখে ফেলছে | হাতের লেখা বড় সুন্দর তার, গোটা গোটা | এরপর মা বললেন লেখ 'ধাম' | নারাণ আর লেখে না | তেল চুপচুপে চুল টেনে টেনে এক অদ্ভুত কৃষ্ণচূড়া বানিয়ে ফেলেছে মাথায় | মা তাড়া দিলেন, "কিরে, লিখলি? লিখছিস না কেন?"

নারাণ করুণ স্বরে উত্তর দিল, "সেঠি তো পড়ি নাই রে মা | সেঠি তো পড়াস নাই রে তু |" বহু সময় ও কথা খরচ করেও নারাণের

মাথায় বানানের কানুন ঢুকল না | কিন্তু সে ইংরেজি বর্ণমালা শিখে ফেলেছে; এক থেকে একশো অবধি দুই ভাষাতেই গুনতে শিখেছে | ছোটখাটো যোগ বিয়োগও শিখে ফেলেছে | কিন্তু ওই অবধিই | ও জবাব দিয়ে দিল, "অত কঠিন পাঠ পারবনি রে মা |" যাইহোক, মা'র কাছে বাংলা ও ইংরেজিতে নাম সই করতে শিখে নারাণ বিদ্যাশিক্ষায় ইতি টানল | সন্ধ্যে হলেই ঠাকমার কাছে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনে টেনে ঘুম | ঘুম থেকে তুলে রাতের খাবার খাওয়ানোও যায় না | কিন্তু ভোর হলে ওর জুড়ি মেলা ভার | দৌড়ে লাফিয়ে কাজ করে ও |

এরই ফাঁকে কত্তাবাবু তাকে বাড়ির নতুন কুকুর, ডেভিলকে নিয়ে হাঁটতে যেতে শিখিয়েছেন | ডেভিল কয়েক মাসের বাচ্চা, কিন্তু ওর এক টানে নারাণকে ধরাশায়ী হওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না | তাই কত্তাবাবু ওকে এখনও একা ডেভিলের সঙ্গে ছাড়েন না | আস্তে আস্তে নারাণ ডেভিলকে সামলাতে শিখল | ডেভিল ওকে ভয় পায় ও মান্য করে | বড়রা সবাই বারণ করা সত্ত্বেও, একটা সময় এল যখন ডেভিলের চেন নারাণ নিজের গলায় মালার মতো পরে চেন ছাড়াই ডেভিলকে হাঁটায় | মা, ঠাকমা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "যদি কাউকে ও কামড়ায় তখন কী করবি? পাড়ার লোকে তো তোকে ধরে পিটবে |" নারাণের উত্তর, ডেভিল ওকে মানে, ওর সঙ্গে বেরিয়ে ওসব বাজে কাজ ডেভিল করবে না |

আগেই বলেছি সত্তর সালটা ঘটনাবহুল | নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে | নারাণদের পাড়াটা নকশালদের এলাকা | পাড়ার নামজাদা নকশাল গগন বা গগনা | গগনের বৌ পুত্তলি আবার মা'র ছাত্রী ছিল ইস্কুলে | নারাণ মুগ্ধ | মা তাকে পড়াইছে, দাদা-দিদিকে পড়ায়, আবার ভয়াভয় নকশাল পত্নীকেও পড়াইছে! মাকে নিয়ে নারাণের গর্ব হয় | জ্বর-জ্বালা, গলাব্যথা, পেট খারাপের ওষুধও দেয় মা | আর কী কী জানে উ? বাবু মুখনাড়া দিলে মা চুপ করে থাকে | তখন বাবুর ওপর বেজায় রাগ হয় নারাণের; দুঃখ হয় মা'র জন্য | একদিন সে মাকে বলল, "তু কেনে চুপ করে মুখনাড়া খাস? চল আমার সঙ্গে, মোদের গেরামে বদ্যি লাই | তু ওখানে গিয়া ডাক্তারি করলে অনেক টাকা পাইবি | মোরা মা ছেলা থাকব কেনে |"

নকশালদের উৎপাতে কত্তাবাবু প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন না | যখন সপ্তাহে একবার-দু'বার বাড়ি ফিরতেন সেই ফেরাটা হতো নাটকীয় | ওঁদের এক পড়শীর বুদ্ধিতেই এই ব্যবস্থা | বাড়ি ফেরার একঘন্টা আগে কত্তাবাবু ওঁকে ফোন করে দিতেন | উনি পাড়ার অন্য বাসিন্দাদের জানিয়ে দিতেন | সবাই তখন বাইরের আলো জ্বালিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন, যাতে অন্ধকারে কেউ লুকিয়ে থেকে কত্তাবাবুকে গুলি করতে না পারে | কিছুদিন আগেই 'যুগান্তর' পত্রিকার এক শরিককে ও আর একজন পুলিস অফিসারকে এ পাড়াতে নকশালরা হত্যা করায় এই সাবধানতার ব্যবস্থা | যখন কত্তাবাবু বাড়ি ফিরতেন তখন রাতে শোবার সময় বালিশের তলায় লোডেড রিভলভার নিয়ে শুতেন | একদিন রাতে ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে, কত্তাবাবু তড়াক করে খাট থেকে নেমে, দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে রিভলভর তাক করে বাইরে তাকালেন, প্রয়োজনে নিজেদের নিরাপত্তার কারণে নকশাল হামলাদারকে গুলি করার জন্য | দেখলেন ঠাকমা বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছেন | এইদিন প্রথমবার কত্তাবাবুকে কাঁদতে দেখা গেল | মাঝরাতে ঠাকমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বাচ্চা ছেলের মতো সেদিন উনি কেঁদেছিলেন | আর একটু হলে উনি মাতৃহন্তা হয়ে যেতেন | নারাণের সমস্যা এই যে কত্তাবাবু প্রায়ই বাড়ি ফেরেন না; উনি থাকেন কোথায়? নারাণ কোনো জড়তা না করে কৌতূহল মেটাতে একদিন প্রশ্নটা মা, ঠাকমাকে করেই ফেলল | "বাবুটা যে বাড়ি আসে না উহা থাকেটা কোথাকে? উহার কি আর একটা সংসার আছে?" প্রশ্ন শুনে সবার সে কি হাসি | নারাণ বলল, "এত হাসলো কেনে? মোদের গেরামে কত এমন আছে তো!" হাসির রোল থামলে নারাণের প্রশ্নের উত্তর মিলল | বাবু বাড়ি না ফিরলে জ্যেঠুর বাড়িতে থাকেন | নারাণ বলল, "ওহ, আই তো ভাবলি বাবুটা সবার বরাত আছে |"

এখানে একটু জ্যেঠুর কথা বলে না রাখলে গল্পের খেই হারিয়ে যাবে | জ্যেঠু বাবুর দাদা নন, বন্ধু | বড় কাছের মানুষ | ওঁরা দুই বন্ধু হিসাব করে দেখেছিলেন, জ্যেঠু বাবুর থেকে এক বছরের বড় | তাই বাচ্চাকাচ্চাদের কাছে একজন জ্যেঠু আর অন্যজন কাকা | বন্ধুত্ব এতই গাঢ় যে বহুদিন পর্যন্ত দাদা দিদি বা জ্যেঠুর তিন ছেলেমেয়ের কেউই জানত না যে ওঁরা ভাই নন, বন্ধু | যদিও স্বামীদের মাধ্যমেই মা ও জ্যেঠিমার পরিচয় তবু তাঁদের দুজনের খুব সদ্ভাব | তাই ছুটিছাটায় পরস্পরের বাড়ি গিয়ে থাকাথাকি লেগেই থাকত |

একদিন সকাল। বাবু আগের রাতে বাড়ি ফিরেছেন। ডেকে পাঠালেন পাড়ার বাসিন্দা নামজাদা ওয়াগন ব্রেকার, কালাকে। কালা এখন নকশালও বটে। কত্তাবাবু কালাকে চা বিস্কুট খাইয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে, ডিপার্টমেন্ট থেকে তো বলছে বাড়ি ছাড়তে। তোর কী মত, যাব না থাকব? থাকলে কি আমাকেও মেরে ফেলবি?"

কালা সবিনয়ে উত্তর দিল, "কী যে বলেন কাকাবাবু! আপনাকে মারার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

বাবু বললেন, "আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের? তাদেরও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছিস, নাকি খালি আমার?"

কালা উত্তরে বলল, "আমরা আপনার বা কাকিমাদের দিকে তাকাবও না। তবে ছোড়দা সিপিএম করে, ওর জন্য কথা দিতে পারছি না।"

সেদিনই রাতে কত্তাবাবু ওঁর বড় বোন-ভগ্নিপতিকে ফোন করলেন। তাঁরা থাকেন নাগের বাজারে। ছোটকার ওখানে থাকার ব্যবস্থা হ'ল। নাগের বাজারটা সিপিএমদের ঠেক।

কালার সঙ্গে এই কথোপকথনের কয়েকদিন বাদেই এক সকালে কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা দপ্তর কত্তাবাবুকে জরুরি তলব পাঠাল। তাদের খবর, আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে নকশালরা তাঁকে খুনের চেষ্টা করবে। তাঁর পরিবারেরও যাকে পাবে তাকেই খুন করবে। রাতে আক্রমণের পরিকল্পনা, যাতে সবাইকে বাড়িতে পাওয়া যায়। তাঁকে কয়েক ঘন্টা সময় দেওয়া হ'ল। ওঁর জন্য কোয়ার্টার মজুত আছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে এবার উত্তর কলকাতার বাস তুলতে হবে।

কত্তাবাবু মাকে ফোন করে জানালেন। মা'র মাথায় যেন বাজ পড়ল। এত তাড়াতাড়ি সংসার গুটিয়ে, বাড়ি বন্ধ করে, অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে কী করে পাড়ি দেবেন! বাবু বললেন যে মাকে কিছু করতে হবে না। পুলিস আসছে ওঁদের বের করে আনার জন্য, কাকপক্ষীও যেন টের না পায় কী হচ্ছে। দিদির স্কুল দক্ষিণ কলকাতায়; তাকে নিয়ে চিন্তা নেই। ঠাকমাকে সব জানিয়ে মা ছুটলেন দাদাকে স্কুল থেকে তুলতে।

ঠিক দু'ঘন্টা পর পুলিসের লরি ও জনাদশেক সশস্ত্র সেপাই বাড়ির সামনে হাজির। সঙ্গে একটা জীপ। সেপাইরা খাটবিছানা লরিতে তুলতে লাগল। এসব কান্ড দেখে মা বাবুকে ফোন করলেন। বক্তব্য, এরা সব যেমনকার তেমন লরিতে তুলছে। আলমারিও তুলতে চাইছে। লকারের গয়না, টাকাকড়িও বের করার সময় দিচ্ছে না। বাবু বললেন ও নিয়ে চিন্তা না করতে, সবকিছু পুলিসের হেফাজতে থাকবে, কিছু চুরি হবে না। এখন সবাই ওখান থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসাটাই বেশি জরুরি। এসব চলতে চলতেই খবর পেয়ে জগন্নাথ হন্তদন্ত হয়ে হাজির। মা বললেন, "কী রে, নারাণকে তুই নিয়ে যাবি না আমরা সঙ্গে নেব?" জগন্নাথের মত নারাণ মা'র সঙ্গেই যাক। এপাড়ায় থাকলে নারাণকেও নকশালরা অন্য নানান বাচ্চার মতো ভালমন্দ খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে দলে ভিড়িয়ে নিলে ও খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। তাই হ'ল। নারাণ গোল গোল চোখে পুলিসের জীপে চড়ে রওনা হ'ল নিরুদ্দেশের পথে।

মা, ঠাকমা যখন নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যাত্রী, বাবু তখন গিয়ে ওঁদের জন্য নির্ধারিত কোয়ার্টার দেখে এসেছেন। কোয়ার্টার তেমন পছন্দ হয়নি। সুতরাং উনি ওখানে ওঁর পরিবার তুলবেন না। সবাই মিলে গিয়ে ওঠা হ'ল জ্যেঠুর বাড়িতে। বড়রা যখন অতি কঠিন সময়ের সঙ্গে লড়ছেন, ছোট মহলে তখন মোচ্ছব লেগে গেল। শুরু হ'ল খেলা, আড্ডা ইত্যাদি। দলে ভিড়ল নারাণও।

উত্তর কলকাতার বাস উঠলেও, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এল কই? মাঝ বছরে দাদার স্কুল বদল করা গেল না। তাকে বছরের শেষ অবধি উত্তর কলকাতার স্কুলেই যেতে হবে। সশস্ত্র সেপাইদের সঙ্গে যাওয়া আসা, মায় ক্লাসের মধ্যেও তাঁদের ঢুকে বসে থাকাটা ছোট্ট দাদার জন্য বড় পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। ক্লাসের বন্ধুরা তাকে এই নিয়ে খেপায়। টিফিনের সময় যখন বন্ধুরা মাঠে খেলা করে, তখন দাদাকে এই সেপাইকাকুর সঙ্গে ক্লাসরুমের ভেতরে বসে থাকতে হয়।

প্রায় মাসখানেক জ্যেঠুর এলগিন রোডের বাড়িতে থাকার পর কত্তাবাবু যে বাড়ি দেখলেন, তা ওঁর মনে ধরল। মনে ধরার মতোই বাড়ি। পার্ক স্ট্রিটের ওপর, দু হাজার স্কোয়ার ফিটের চেয়ে একটু বড়, খোলামেলা। সামনে বাগানওয়ালা পুরো একতলাটা ওঁদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এ বাড়ির ছাদে সারভেন্টস কোয়ার্টার, পিছনে বাবুর্চিখানা। নারাণদের সাধারণ জীবনে এই অতিরিক্তগুলো মূল্যহীন। কিন্তু লাভ বা মজা যাই হোক না কেন সেটা হ'ল ডেভিলের। এক বছরের কম এই চারপেয়েটির নাকি অনেক মাংস খাওয়া প্রয়োজন। ঠাকমার

জন্য বাড়িতে মুরগি বা গরুর মাংস ঢোকে না। খালি ঠাকমাকেই দোষ দিয়ে কী লাভ? উত্তর কলকাতা হিন্দু প্রধান অঞ্চল; চাইলেও ওখানে গরুর মাংস পাওয়া যায় না।

অথচ সমানেই গোডাইক্কারের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হয় – "পেডিগ্রি কুকুর, ওকে মাংস খাওয়ান বৌদি, নইলে ভাল করে বাড়বে না।"

বাবুর্চিখানার দৌলতে ডেভিলের কপাল ফিরল। গোডাইক্কারের তত্ত্বাবধানে ডেভিলের জন্য বরাদ্দ হ'ল গরুর মাংস। আলাদা হাঁড়িতে, হলুদ ও ডালিয়াসহ মাংস রান্না হতে লাগল রোজ তার জন্য। দায়িত্ব চাপল গিয়ে নারাণের ওপর। মা দেখিয়ে দিলেন। সকালে জলখাবারের পর নারাণ উনুনে আঁচ দিয়ে, মাংস নিয়ে আসে। মাংস ধুয়ে, মার দেখানো মাপমতো জল, হলুদ, ডালিয়া দিয়ে চাপিয়ে দেয়। মাংস রান্না হয়ে উনুন নিবে যায় নিজের থেকেই। দিদি হাতে করে না খাওয়ালে ডেভিল খায় না। চার মাস বয়সে মর মর অসুখের সময় থেকেই এই সুখের অভ্যেস ডেভিলের। দিদি স্কুল থেকে ফিরে জামাকাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে ডেভিলের খাবার তৈরী হয়ে ঠান্ডা করে রাখা থাকে। ডেভিলকে গরম খাবার দেওয়া নিষেধ। নারাণ বোঝে না, তাই যদি হবে, তবে মা যখন রাতে রুটি করে, আর সেগুলো ডেভিলকে দেয়, তখন? সেও তো গরম! সেগুলো ডেভিল খায় কী করে!

নারাণ এপাড়ায় এসেও মা'র সঙ্গে দোকান বাজারে যায়। তবে এবার খালি ওকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নয়, মা'রও এই নতুন জায়গায় পরিচয় স্থাপন করা দরকার। এমনই একদিন বাড়ি ফেরার পথে নারাণের প্রথম সাহেব-মেম দর্শন। মুক্তকণ্ঠে আঙুল দেখিয়ে নারাণ বলল, "দেখ কেনে কি সাদা ওই ছেলাপান দুটা!" মা বোঝালেন, ওরা সাহেব, ওদের গায়ের রং ওরকমই হয়। ওরা বাংলা বোঝে না, নারাণ যেন ওদের সঙ্গে ভাব করতে না যায়। এপাড়ায় খ্রীষ্টানদের দুটো গোরস্থান ছিল। সেখানে কিছু অল্পবয়সী হিপি বাসা বেঁধেছিল। গাঁজা ইত্যাদি টানত মনের সুখে। মা ওকে একটু ভয়ই দেখালেন, ওকে হিপিদের সঙ্গে ভাব জমানোর থেকে বিরত রাখার চেষ্টায়। নারাণ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল আশ্চর্য জীব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে। প্রশ্নটা নারাণ ছুঁড়েছিল বেশ খানিকক্ষণ পরে আর অপ্রাসঙ্গিকভাবে। মা প্রথমে বুঝতেই পারেননি ও কী বিষয়ে কথা বলছে। নারাণের বক্তব্য হ'ল ও কোথাও শুনেছে সাহেবরা খুব বড়লোক হয়। "তবে ওদের বাড়ির ছেলাপানগুলা গোরস্থানে কেনে থাকে? উহাদের বাড়ি নাই কেনে? কেনে শীতকালে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে দুজনেই রাস্তা চলে?" সাহেবরা বড়লোক, এই জ্ঞান নারাণের কোথা থেকে হ'ল তাই নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেও কোনো নিষ্পত্তি হ'ল না। মাঝখান থেকে ছোটকা ওর নামটা দিল বদলে। "আজ থেকে তুই আর শ্রী নারায়ণ সাউ নয়, তুই শ্রী নারায়ণ সাহেব।" এই নাম বদলে নারাণ আহ্লাদে একেবারে গদগদ।

ঠিক যেমন উত্তর কলকাতা ছাড়ার আগে কত্তাবাবু প্রায়ই জ্যেঠুর বাড়িতে থেকে যেতেন, তেমনি পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে আসার পর এক ভদ্রলোক প্রায়ই নারাণদের বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করলেন। বলা বাহুল্য, উনিও পুলিস। বাড়ি বেহালায়, সেও এক নকশাল পট্টি। ওঁর গায়ের রং ছিল নির্ভেজাল কালো। নারাণ ওঁর নাম দিল 'কেল্লেবাবু'। তাই নিয়ে দাদা, দিদির সঙ্গে হাসাহাসি। মা, ঠাকমাও হাসলেন। কিন্তু সাবধানও করে দিলেন সবাইকে। বাবু বা ওঁর সহকর্মীর সামনে যেন ওই নাম ভুলেও মুখ দিয়ে বের না হয়। বাবুর সামনে বের হলে আর রক্ষে নেই, আর কেল্লেবাবু শুনে ফেললে লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না। প্রায় বছর দেড়েক টানা কেল্লেবাবু রাতে নারাণদের বাড়িতে থেকেছেন। এ সময়ে নারাণের সঙ্গে কেল্লেবাবুর কিছু আদানপ্রদানের কথা উল্লেখ না করলে নারাণকে ছোট করা হয়।

নারাণদের বাড়িতে কিছু নিয়ম খুব কড়াকড়িভাবে সবাইকে মেনে চলতে হতো। এর মধ্যে একটা ছিল, গুরুজনদের হাতে জুতো না দেওয়া। নারাণ এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে ও পড়েওনি কখনও এর আগে। একদিন সকালে কত্তাবাবু বের হবেন, কোনো বিশেষ কারণে ওঁর সেদিন অতিরিক্ত একজোড়া জুতো লাগবে। বেরোবার জন্য তৈরি হতে হতে উনি নারাণকে জুতোজোড়া দেখিয়ে বললেন ওটা জীপে তুলে দিতে। নারাণের বাবুর গাড়ির কাছে যেতেও ভয় করত। উহার ডেরাইভারটাও পুলিস!

কেল্লেবাবু প্রায়ই বাবুর সঙ্গেই বেরিয়ে যেতেন। নারাণ দেখল কেল্লেবাবু বের হচ্ছেন; মানে আজ উনি বাবুর সঙ্গে যাবেন। সেই ভেবে ও কেল্লেবাবুর হাতে বাবুর জুতোজোড়া দিয়ে ফরমাস

করল, "বাবুর জুতাজোড়া গাড়িতে নিয়ে যা মোর লিগে।" কেল্লেবাবু জুতোজোড়া নিয়ে বের হচ্ছেন, এমন সময় বাবুর চোখে পড়ে গেলেন। আর যাবে কোথায়! বাবু মুহূর্তে রেগে আগুন। নারাণকে এই মারেন কি সেই মারেন। চেঁচামেচি শুনে মা, ঠাকমা ও অন্য সবাই বেরিয়ে এল। নারাণ এক ছুট্টে মা'র পিছনে। বাবু তড়পাচ্ছেন। নারাণও ছাড়ার পাত্র নয়। তড়পানির ফাঁকে ফাঁকে মা'র পিছন থেকে মাথাটা একটু বের করে, "আই কি করলি" বলেই আবার মা'র পিছনে। খানিকক্ষণ এইভাবে গর্জন ও আই কি করলি চলার পর বাবু মা'র শিক্ষার দোষ ধরতে ধরতে বেরিয়ে গেলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে নারাণকে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা বোধগম্য হ'ল। মা, ঠাকমা এতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনার কিছুই জানতেন না। তখন নারাণকে বোঝানো হ'ল ও কী অন্যায় করেছিল। দাদা দিদির হাসি আর থামে না। নারাণ বলল, "মা না বাচাইলে বাবু আজ মুরে ঠিক মারত, আর তুরা হাসছিস? মুই এই তোদের সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম।"

এই ঘটনার পর থেকে ছোটকা, বা দাদা-দিদিরা কেউ "আই কি করছিস" বললেই নারাণ বুঝে যেত যে ও যেটা করছে বা বলছে সেটা না করাই ওর জন্য মঙ্গল।

এমন করেই নারাণের জীবন বইছে কলকাতায়। স্কুলগুলো গরমের ছুটিতে বন্ধ। এমনি এক সকালে নারাণকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মা চিন্তিত হলেন, নতুন জায়গা, যদি হারিয়ে যায়! উনি দাদা, দিদিকে পাঠালেন ওকে খুঁজতে। দাদা সুযোগ পেয়ে নারাণকে খোঁজার বদলে বন্ধুর বাড়িতে চলে গেল। খানিক খুঁজে দিদি নারাণকে পেল বাড়ির ছাদে। ও মহানন্দে একটা আম খাচ্ছিল। দিদিকে দেখে একগাল হেসে বলল, "মাকে বলিস না।"

সব শুনে মা বললেন, "বেশ করেছিস। যখন ইচ্ছা খাবি।" চাবি পর্বের পর নারাণ এছাড়া আর কোনোদিন কিছু চুরি করেনি।

আবার কেল্লেবাবু ও নারাণ উপাখ্যান। অন্যান্যবারের মতোই আবার জ্যেঠিমা চলে এলেন তাঁর তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে নারাণদের বাড়িতে কিছুদিন কাটাবেন বলে। এই তিন জনের বয়সও মোটামুটি দাদা-দিদিদের মতোই। দু'মাথার থেকে পাঁচ মাথার বুকের পাটা অনেকখানিই বেশি স্ফীত হয়। সুতরাং চুরুটপিয়াসী কেল্লেবাবুর চুরুট চুরির ফন্দি আঁটা শুরু হ'ল। বিড়ি সিগারেট দুটোই সেবন করে দেখা গেছে এর আগে, বাকি এই হাতের নাগালের মধ্যের চুরুটখানা।

কেল্লেবাবুর অনুপস্থিতিতে ওঁর ঘর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উনি একটা চুরুট একটু একটু করে টানেন, এবং সেটা শেষ হওয়ার আগেই আর একটা নতুন চুরুট এনে রাখেন। ওই নতুনটা চুরি করতে হবে। পরিকল্পনা করা সহজ, কিন্তু চুরিটা করবে কে? নারাণ বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। "আমায় যদি তোদের সঙ্গে নিস, মুই চুরি করতে রাজি।" ওকে কম দিলে চলবে না। সমান সমান ভাগ চাই ওর। যেমনি কথা, তেমনি কাজ। নারাণ সুট করে চুরুটখানা চুরি করে এনে দাদা-দিদিদের কাছে জমা করে দিল। পরের দিন সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে; কারণ দুটো – এক, যদি কেল্লেবাবু চুরি যাওয়া চুরুটের কথা তোলেন, খুঁজে পাওয়ার ভান করে তা ফেরত দিতে হবে। চোর বানানো হবে ডেভিলকে। অন্য বড় কারণ, বাবু বের হবার পর মা, ঠাকমা রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ছাদে গিয়ে চুরুট সেবন করতে হবে। ধরা পড়লে চলবে না। চুরুট খাওয়ার পর সবাই নিচে এসে আর একদফা দাঁত মেজে নেবে ঠিক হ'ল। মুখে যাতে কেউ গন্ধ না পায়। কিন্তু সবকিছু তো হিসাবমতো হয় না। যে চুরুটের গন্ধে বাড়ি ম ম করে, সেই চুরুটের এই দুর্দান্ত প্রতাপের কথা আন্দাজই করা যায়নি। বাথরুম দুটো, গ্রাহক ছ'জন। ক্রমানুসারে নারাণ সবার শেষে, কারণ ও সবার ছোট। ওকে কেউ বাথরুম ছাড়ে না। শেষে, "মাকে বলে দিব মুই"-এর হুমকি দিয়ে সে সেদিন বেঁচেছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের খবর ভুয়ো ছিল না। কত্তাবাবুরা উত্তর কলকাতার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে নকশালরা ওঁদের বাড়িতে হামলা করে। মানুষজন না পেয়ে গোটা বাড়িটাকেই বোমা মেরে একেবারে ভেঙে ফেলে। দেশ বিভাগের সময় সব খুইয়ে কলকাতায় আসার পর, বড় শখ করে ও কষ্ট করে সে বাড়ি কত্তাবাবু করেছিলেন। শখ করে ঠাকমার নামে বাড়ির নামকরণ করেছিলেন। সেই বাড়ি ভাঙার খবর যেদিন পেলেন, সেদিন কত্তাবাবুর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে কলকাতা আবার ছন্দে ফিরতে বাহাত্তর সাল পার হয়ে গেল। এর পর কত্তাবাবু আর মা বাড়িটা সারাবার কথা ভাবতে শুরু করলেন।

লেকের ধার

শঙ্কর তালুকদার

ঘটনা আসে, ঘটনা যায় | চিরাচরিত নিয়মে তারা সারিবদ্ধ | ফেলে আসা জীবনে এমন কত ঘটনাই চাপা পড়ে যায় সময়ের প্রবাহে | তবু কিছু কিছু ঘটনা যেন জ্বলতে থাকে তারার মতো | শান্তিনিকেতনে বড় হবার কল্যাণে প্রকৃতির প্রতি বিশেষ এক আকর্ষণ জন্মেছিল ছোটবেলা থেকেই | তাই সেখানকার পড়াশোনা শেষ করে শহর কলকাতায় ফিরে এসে বার বার তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি – কখনও কোনও লেকের ধারে, কখনও কোনও কবরস্থানে, যেখানে ট্রাম-বাসের আওয়াজ ম্লান থেকে ম্লানতর, যেখানে আলোর ঝলকানি কম – প্রকৃতি সহজ স্বাভাবিক নিজের রূপে প্রকাশিত |

সেদিন পূর্ণিমা, আমরা কয়েকজন বন্ধু গিয়েছি লেকের ধারে বেড়াতে | গরমের আতিশয্যে ক্লান্ত শরীর, কখন প্রকৃতির সুন্দর মসৃণ ঘাসের আস্তরণের বিছানায় শুয়ে পড়েছি | মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে আসছে জলের উপর দিয়ে, যেন অতি চুপিচুপি শিশুর দল আসছে এগিয়ে দুষ্টুমিভরা চোখে | তাদের কচি ঠান্ডা হাতের স্পর্শে এক তৃপ্তিবোধ শরীর-মনকে করে তুলেছিল রোমাঞ্চিত | দূরে গাছের ফাঁকে চাঁদ বুঝি হেসে হেসে দেখছিল সেই খেলা |

আলোর বন্যার
যত হাসি
পাতার বুকে
রাশি রাশি |
তারই ঝলক্
পড়ল এসে
আমাদের পদতলে |
ঘুম পাড়ানি
গানের রেষে
মোহন মায়ায় বাঁধে |

হঠাৎ এক করুণ সুর সব ওলট পালট করে বেজে উঠল, 'বাবু, দুটি লজেন্স নেবেন?' এক ঝটকায় কোন এক স্বপ্নপুরী থেকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি, যেখানে দৈন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে | প্রয়োজন ছিল না লজেন্সের, কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন – তার নগ্ন রূপ অনেক সময় সহ্যের বাইরে | বোধহয় সেই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে বিরক্তি সহকারে তাড়াতাড়ি লজেন্স কিনে তাকে বিদায় করলাম |

এক লহমায় সবাই যেন কোথায় পালিয়ে গেল | সেই চাঁদ আর হাসে না | সেই শিশুর দল আর হামাগুড়ি দিয়ে আসে না | অবশেষে উঠি উঠি করছি এমন সময় সেই কঙ্কালসার চেহারার লোকটি আবার এসে উপস্থিত, 'বাবু আপনি ভুল করে বেশি পয়সা দিয়েছেন' |

অবাক চোখে তাকিয়ে এই প্রথম দেখলাম সেই পরমাত্মাকে, যাকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে মনে দ্বিধা ছিল | সেই শুদ্ধ আত্মাকে সম্মান জানাতে সে পয়সা আর ফেরৎ নিলাম না | অসংখ্য শুভেচ্ছা বাণী উচ্চারণ করতে করতে তিনি বিদায় নিলেন |

বুকের মাঝে কোন এক গুঞ্জরন চেঁচিয়ে বলতে চাইল – হায় রে সততা!

পড়ন্ত বেলার কাব্য

কৃষ্ণা গুহ রায়

প্রণবেশ ঘড়ির দিকে তাকালেন। এখন বেলা প্রায় দুটো। ঋভু, রানা, রিমঝিম এখনও ফেরেনি। ছেলে, বৌমা, নাতির সঙ্গে সাতদিনের জন্য পুরীতে ঘুরতে এসেছেন প্রণবেশ। দেখতে দেখতে চারটে দিন কেটে গেল। এর আগেও তিনি তিনবার পুরীতে এসেছেন। কিন্তু বৌমা, নাতির সঙ্গে এই প্রথম। এবারে প্রণবেশের আসার তেমন ইচ্ছা ছিল না। বৌমাকে বলেছিলেন, তোমরা ঘুরে এসো, আমি তো অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু ঋভু নাছোড়বান্দা, দাদানকে যেতেই হবে, নইলে সেও যাবে না। তাই প্রণবেশ আর আপত্তি করলেন না, রাজী হয়ে গেলেন। চিন্তার ফাঁক গলে ডোর-বেলটা বেজে উঠল। রানা, ঋভু, রিমঝিম হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। রিমঝিম এসেই বলল, "বাবা বড্ড দেরী হয়ে গেল, আসলে শপিং করতে করতে ঘড়ির দিকে আর খেয়ালই করিনি। আপনাকে এতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকতে হয়েছে।"

প্রণবেশ স্মিত হেসে বললেন, "না বৌমা বাড়ির রুটিন কি আর বাইরে ঘুরতে এলে চলে? এবার চলো একসঙ্গে খেতে যাই।"

ঋভু তার দাদানের কোলঘেঁষে এসে বসল। প্রণবেশের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "জানো দাদান, আমার না এখানে একটা বন্ধু হয়েছে।"

- "তাই বুঝি, তা – কী করে হ'ল?"

- "আজকেই হয়েছে। বনিতা, ও ক্লাস টু-তে পড়ে।"

- "আর বলবেন না বাবা, অনেকদিন পরে আমার কলেজের বন্ধু রিনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ওরা পুরো ফ্যামিলি নিয়ে ঘুরতে এসেছে, এই হোটেলেই উঠেছে।"

- "বাহ্, এ তো ভালই হ'ল। ঋভু একজন সঙ্গী পেল।" প্রণবেশ বললেন।

রিমঝিম হাসতে হাসতে বলল, "বাবা রিনা কিন্তু ওর মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আপনিও একজন কথা বলার মানুষ পাবেন।"

- "তা বেশ তো, ভালই হবে।" প্রণবেশ রসিকতা করে উত্তর দিলেন।

- "তাহলে চলুন, ওরা আমাদের জন্য ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করছে। আজকের লাঞ্চ একসঙ্গে হবে।"

- "হ্যাঁ চলো, অনেক বেলা হয়ে গেল।"

ডাইনিং হলে একটা বড় টেবিল নিয়ে রিনারা বসেছিল। রিমঝিমকে ঢুকতে দেখেই রিনা চেঁচিয়ে উঠল, "এই এদিকে আয়, এদিকে।"

রিমঝিমই সবার সঙ্গে প্রণবেশের পরিচয় করিয়ে দিল। রিনার স্বামী রঞ্জন, ওদের মেয়ে বনিতা, আর রিনার মা প্রমিতা। খেতে বসে গল্প করতে করতে বেশ অনেকটাই সময় কেটে গেল। কথায় কথায় প্রণবেশ জানতে পারলেন, রিনারা সল্টলেকে থাকে। রিনার স্বামী রঞ্জনের দিল্লিতে পৈতৃক বাড়ি। ওর বাবা, মা সেখানেই থাকেন। রঞ্জন ছোটবেলা থেকেই ভবানীপুরে মামারবাড়িতে মানুষ। এখন কলকাতারই একটা নামী কলেজের অধ্যাপক। রিনাও একটা স্কুলে পড়ায়। খাওয়ার ফাঁকে প্রণবেশের সঙ্গে বেশ কয়েকবার প্রমিতার চোখাচোখি হ'ল। প্রমিতা চোখ সরিয়ে নিলেন। সবার খাওয়া মোটামুটি একসঙ্গেই শেষ হ'ল। রিমঝিম সবার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যেবেলা আবার বেরোব।

রিনাও বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাই বরং ভাল হবে। আজকের ডিনারটা হোটেলের বাইরে কোথাও সেরে নেব।"

প্রমিতা ওদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, "তোরা বরং ঘুরে আসিস, আমার আর হাঁটাহাঁটি করতে ইচ্ছা করছে না।"

রিমঝিম প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, আপনি আজকে সকালবেলা আমাদের সঙ্গে বেরোননি, বিকেলবেলায় কিন্তু যেতে হবে।"

- "না বৌমা, এখন আর অত ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগে না। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে বেশি ভাল লাগে। তোমরাই বরং যেও, ঘুরে এসো।"

সন্ধ্যে সাতটা বাজতেই ঋভুরা দলবেঁধে ঘুরতে বেরিয়ে গেল। এক বেলার মধ্যেই ঋভু আর বনিতার মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বনিতা চটপটে স্বভাবের মেয়ে। বেরোবার আগে প্রণবেশের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করল। তারপর 'টা টা' করে ঋভুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

হোটেলের ঘরগুলোর সামনে একটা লম্বা টানা বারান্দা, এল-এর মতন বেঁকে গেছে। সেখানে কতকগুলো চেয়ার পাতা। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে খুব কাছ থেকে সমুদ্র দেখা যায়। প্রমিতা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন জোয়ার চলছে,

সমুদ্রের ঢেউগুলো ফুলে ফুলে বালির উপরে আছড়ে পড়ছে। পূর্ণিমায় আকাশে চাঁদটা মায়াবী রূপ ধারণ করেছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আরও মোহময় হয়ে উঠেছে। সমুদ্র সৈকতে মানুষের ভিড়। দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। দূর থেকে দেখতে বেশ ভালই লাগছে প্রমিতার।

- "মিতা!"

অনেকদিন আগের চেনা সেই নামটা শুনে চমকে উঠলেন প্রমিতা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন প্রণবেশ তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মৃদু হেসে প্রমিতা বললেন, "পুরনো এই নামটা এখনও ভোলোনি দেখছি।"

- "কী করে ভুলব মিতা? আজ এত বছর পরে তোমাকে এখানে, এভাবে দেখব তা কি কখনও ভাবতে পেরেছিলাম।"

- "আজকে দুপুরে ডাইনিং হলে তোমাকে দেখার পর থেকে কী মনে হচ্ছিল জানো?"

- "কী?" প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

- "কাছের মানুষরা কখনও হারায় না, অসংখ্য অপরিচিত মানুষের ভিড়ে পরিচিত মানুষরা লুকিয়ে থাকে। জীবনের চোরা স্রোতে ভাসতে ভাসতে আবার ঠিক তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।"

প্রণবেশ চুপ করে থাকলেন। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে দুজনেই নতুন করে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের জীবনের পথচলা শুরু হয়েছিল কলেজের আড্ডায়, কফি হাউসে, কবিতা আর নাটকের মধ্যে দিয়ে। সেই সময়টা ছিল ছয় দশকের শেষ। দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। উত্তাল রাজনীতি, নকশাল আন্দোলন সবকিছু মিলিয়ে কলকাতার তখন খুবই টালমাটাল অবস্থা। নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন প্রণবেশ। আন্দোলনে প্রণবেশের জেল হ'ল। প্রমিতাও বাধ্য মেয়ের মতন বাবা-মায়ের নির্বাচিত ডাক্তার পাত্রকে জীবনসঙ্গী রূপে গ্রহণ করলেন। তারপর নকশাল আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হবার পর প্রণবেশ জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

- "তোমরা কি এখনও মাণিকতলাতেই আছ?" প্রমিতার প্রশ্নে প্রণবেশের ঘোর কাটল।

- "হ্যাঁ, এখনও সেখানেই থাকি। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে সেলস ট্যাক্সে চাকরি পেলাম। তারপর স্ত্রী অতসীর সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরু হ'ল। তোমার বিয়ের খবর আমি জেলে বসেই পেয়েছিলাম।"

প্রমিতা প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্ত্রী কোথায়? আসেননি?"

- "না, বছর তিনেক হ'ল অতসী মারা গেছেন। রানা একটা বহুজাতিক সংস্থার সফটওয়্যার এঞ্জিনিয়ার। ওর অফিস থেকে সুন্দর ফ্ল্যাট দিয়েছে। কিন্তু আমি যেহেতু মাণিকতলা থেকে যেতে চাই না, তাই ও আমাকে একা রেখে কোথাও থাকতে চায় না।

- "বাহ্, আজকালকার দিনে এরকম ছেলে দেখা যায় না।"

প্রমিতার ফোনটা বেজে উঠল। ওপাশ থেকে রিনার গলা ভেসে এল – "মা, তোমাদের খাওয়া হয়ে গেছে? আমরা আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ফিরছি।"

কথায় কথায় কখন যে রাত হয়ে গেল দুজনের কারুরই খেয়াল নেই। ডাইনিং রুমে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলেন। খেতে খেতে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এখনও কবিতা লেখো?"

- "না, বিয়ের পরে ওসব অভ্যাস চলে গেছে। সল্টলেকে মেয়ের কাছে থাকি এখন। আমার স্বামী রজতাভ বছর ছয়েক হ'ল মারা গেছেন। আমাদের সোদপুরের বাড়িটা একটা অনাথ আশ্রমকে দান করে দিয়েছি। ওখানে মাঝে মাঝে যাই। পেনশনের টাকা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আসি, এভাবেই চলছে।"

ঘড়িতে তখন প্রায় রাত এগারোটা। আর কিছুক্ষণ পরেই ওরা এসে পড়বে। ডাইনিং রুমের সামনের বড় করিডোর দিয়ে প্রমিতা হাঁটতে শুরু করলেন। পেছনে প্রণবেশ। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রমিতা।

- "কিছু বলবে?" প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

- "আমাদের নতুন এই পরিচয়টাই যেন ওরা জানে, অতীতকে মনে হয় বর্তমানের মধ্যে না আনাই ভাল।"

প্রণবেশ মাথা নাড়লেন।

সমুদ্রের ঢেউগুলো চাঁদের আলোর জোয়ারে উথাল পাথাল হতে লাগল, যেন চাঁদকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। পড়ন্ত বেলার কাব্য হয়ে, জীবনের ভাঙাগড়ার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে ঢেউগুলো আছড়ে পড়তে লাগল তীরের দিকে।

মাটির টান

সফিক আহমেদ

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী শুনে আমরা অভ্যস্ত, তাই বলে নাকে দড়ি দিয়ে দশদিন মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা বেড়ানো বেশ ঝক্কির ব্যাপার। এত লম্বা দুর্দান্ত, দুঃসাহসিক অভিযান শেষ হয়ে গেছে, এইবার বাড়ি ফেরার পালা।

হোটেলে ফিরে WIFI পাওয়ার পর সেলফোনে তাকিয়ে দেখি অফিস থেকে বার তিনেক যোগাযোগ করা হয়েছে, আর একটা ইমেল এসেছে বড় প্রজেক্ট অ্যাওয়ার্ড হতে আরো দু'সপ্তাহ সময় লাগবে; সুতরাং ইচ্ছা করলে আমি আরো দু'সপ্তাহ ছুটি নিতে পারি।

আমেরিকায় যখন কাজ থাকে, দুটো দিন ছুটি নেওয়াও দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাই বাড়তি ছুটিতে বাড়ি ফিরে না গিয়ে আর কী করা যায় ভাবতে লাগলাম।

হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম বার্সেলোনা থেকে ৭ দিনের Mediterranean Cruise নেওয়া যায়। Costa Cruise-এর প্রমোদ-তরী বার্সেলোনার সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আছে; আগামীকাল যাত্রা শুরু।

টিকিট কেটে চেপে বসলাম প্রমোদ তরীতে। ভূমধ্যসাগরে যাত্রা হ'ল শুরু।

বার্সেলোনা-পালমা দে মালোর্কা-ন্যাপলেস-লা স্পেজিয়া-সাভোনা-মার্সিলে হয়ে ফিরে আসবে আবার বার্সেলোনায়।

প্রমোদতরীতে আছে বিশাল ডেক যেখানে সূর্য এবং সমুদ্র উপভোগ করা যায়। আছে আন্তর্জাতিক শিল্পীদের বিনোদন ব্যবস্থা। সেইসাথে আছে সব বয়সের জন্য স্লাইড আর ওয়াটার গেমসহ সুইমিং পুল, অত্যাধুনিক স্পা, জিম এবং আরো অনেক কিছু। জাহাজে সব সময় চলছে বিভিন্ন পারফরম্যান্স, বিভিন্ন বিনোদন। আর আছে অনেকগুলি থিম লাউঞ্জ-বার, আছে ইতালীয় এবং আন্তর্জাতিক রেস্তোরাঁ – যেখানে চমৎকার সব খাবারের সম্ভার।

এই ইতালিয়ান রেস্তোরাঁর ডাইনিং হল-এ বহুজাতিক সার্ভারদের মধ্যে আমাদের টেবিলে হাসিমুখে এগিয়ে এল আমাদের দেশের একটি ছেলে। বুকের উপর নামের ফলকে লেখা আছে রাজেন। যতই বিদেশে থাকি আর বেড়াই, দেশের লোক দেখলেই একটা আত্মীয়তা অনুভব করি।

ছেলেটি খুব সম্ভ্রম সহকারে আমাদের খাবার অর্ডার নেওয়ার সময় সাহায্য করল আমাদের স্বাদের খাবার পছন্দ করতে, কারণ মেন্যু দেখে আর খাবারের নাম দেখে বোঝা মুশকিল সেটা খাওয়া যাবে কিনা।

ডাইনিং হল-এ ভিড়ের চাপ একটু কমে এলে জানতে পারলাম রাজেন মাইতি আদতে মেদিনীপুর জেলার ছোট মহকুমা শহর তমলুকের বাসিন্দা। বাড়িতে বিধবা মা, বৌ আর একটি চার বছরের বাচ্চাকে রেখে বছরে ১০ মাসেরও বেশি জলের উপর ভেসে বেড়ায় এই প্রমোদ-তরীতে। দশ মাস পরে এক মাসের ছুটি পায় ঘরে ফেরার। আমাদের পশ্চিম বাংলার লোক দেখে জমিয়ে গল্প করার ইচ্ছা থাকলেও শিফট শেষ করার চাপে চলে যেতে হ'ল তাকে।

এরপর আর বিশেষ দেখা হয়নি রাজেনের সাথে। শুধু যখন বিভিন্ন বন্দরে প্রমোদতরী থামত আর আমরা নামতাম কাছাকাছি পর্যটক-আকর্ষণ কেন্দ্রগুলো দেখার জন্য, লক্ষ্য করতাম রাজেন খালিপায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে জাহাজের বন্দরের কাছের মাটি আর ঘাসের উপর; আর মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে হাত বোলাচ্ছে মাটিতে। বারবার এই একই অদ্ভুত আচরণ দেখে কারণ জানার খুব ইচ্ছা হলেও সুযোগ পাইনি কথা বলার।

দশ দিনের সমুদ্র সফরের প্রায় শেষদিকে একদিন দুপুরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একা ডেক-এ বসেছিলাম। রোদে চিকমিক করছে দিগ্বলয় পর্যন্ত জল আর জল। হঠাৎ রাজেনকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে কাছে ডাকলাম। আজ ইউনিফর্মের বদলে সাধারণ পোশাকে তাকে খুব সুদর্শন যুবক দেখাচ্ছে। কাছে আসতে গল্প শুরু করলাম। কিছু কথাবার্তার পর আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম তার খালিপায়ে মাটিতে আর ঘাসে হেঁটে বেড়ানো আর মাটিতে হাত বোলানোর কারণ।

একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, "বছর পাঁচেক আগে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলাম খুশিকে। বাড়ির সামনে অনেকটা জমি পেরিয়ে পাকা রাস্তা। সেই জমির উপর আলতাপায়ে হেঁটে এসে বাড়ির উঠোনে পা দিয়েছিল খুশি।

বিয়ের কিছুদিন পরেই জাহাজের কাজের ডাক আসে। অতএব মা আর খুশিকে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল এই জলে ভাসার

জীবনে | ছেলের জন্ম, প্রথম জন্মদিন – কোনো কিছুতেই থাকতে পারিনি এই রুটিরুজি জোগাড় করার তাগিদে | ছেলের বড় হওয়া, প্রথম টলোমলো পায়ে হাঁটা, প্রথম কথা বলা সবকিছুই আমার চোখের আড়ালে হয়েছে | মাঝেসাঝে বন্দরের কাছাকাছি এসে ফোনে সিগন্যাল পেলে কথা বলতাম আর মানসচক্ষে আমার সংসার জীবনের ছায়াছবি দেখতাম |

বছর দেড়েক আগে ছুটিতে বাড়ি গিয়ে মা, ছেলে, বৌকে নিয়ে খুব আনন্দে কাটিয়েছিলাম | বাড়ির সামনের জমিতে ঘাসের উপর ছেলেকে নিয়ে গড়াগড়ি, রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে খুশিকে নিয়ে হাঁটা, মায়ের হাতের রান্না খাওয়া – চোখের নিমেষে কেটে গিয়েছিল ছুটির কয়েকটা দিন | চট করে সময় এসে গিয়েছিল মাটির টান ছেড়ে জলে ভাসার দিনের |

এক দুপুরে মা আমাকে কাছে ডেকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'বাবা, তুই এই জলে-ভাসা চাকরি ছেড়ে বাড়ির কাছাকাছি কোথাও কাজ খোঁজ | খুশিকে সময় দে, নাহলে তোর সংসার জলে ভেসে যাবে | ওর দূর সম্পর্কের কোন এক আত্মীয়র এত ঘন ঘন বাড়িতে আসা আমার ভাল ঠেকে না |'

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম মায়ের কথা | 'আমি রোজগার না করলে কে মাসে মাসে টাকা পাঠাবে আর তোমাদের সংসার খরচই বা চলবে কী করে? খুশি আর ছেলের একটা ভবিষ্যৎ তৈরী করতে হবে তো!'

পাড়ার দোকানে চায়ের আড্ডাতেও কয়েকটা ফচকে ছোকরা হাসাহাসি করছিল, আর তির্যক মন্তব্য করছিল, 'জলেভাসা স্বামী এসেছে বন্দরে নোঙ্গর ফেলতে | খবরই রাখে না তার চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকছে |' আড্ডা ছেড়ে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলাম | পরের দিন আবার ফিরে যেতে হবে কাজে |

রাতে এক আবেগঘন মুহূর্তে খুশির চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, 'ভাল থেকো আর ভাল রেখো সংসারটাকে | তোমাদের জন্যই আমার এই দিনের পর দিন জলে ভাসা, যাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ পায়ের নিচে একটা শক্ত জমি পায় |' চোখ নামিয়ে নিয়েছিল খুশি | খুশির চোখের ভাষা পড়তে পারিনি | একটা অজানা আশঙ্কা আমার মন ভার করে দিয়েছিল |

ভোররাত্রে ঘুমন্ত ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে, মা আর খুশির কাছে বিদায় নিয়ে মাঠ পেরিয়ে পাকা সড়কে এলাম বাস ধরার জন্য। | তারপর মেদিনীপুর লোকালে হাওড়া হয়ে চলে এলাম দমদম বিমান বন্দরে | কলকাতা থেকে আবুধাবি হয়ে বার্সেলোনা পৌঁছাতে দুদিন কেটে যায় | বার্সেলোনাতে জাহাজে উঠে আবার আমার জলে-ভাসা জীবন শুরু |

মাস তিনেক বাদে একদিন ফোন করতে ধরা গলায় মা বলল, 'খুশি আজ আমার সাথে ঝগড়া করে ঘর ছেড়ে চলে গেল | অসময়ে অজানা লোকজন এখানে আসা আমার অপছন্দ বলায় ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল মাঠ পেরিয়ে | আমি অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলাম ঘাসের জমিতে তোর আলতাপরা বৌ আর ছেলেটার কচি পায়ের ছাপের দিকে |"

এইটুকু বলে রাজেনের গলা ধরে এল |

তাকিয়ে দেখলাম তার চোখের জলে দিকচক্রবালের সমুদ্রের নোনা জলের ধারা যেন মিলেমিশে যাচ্ছে | উঠে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে বলল, "আমি জলে ভাসতে ভাসতে মাটির টান হারিয়ে ফেলছি স্যার | তাই সুযোগ পেলেই এই ধাতব জাহাজ আর জল ছেড়ে মাটির স্পর্শ পেতে চাই | আর ঘাসে হাত বুলিয়ে আমার ছেলেটার টলোমলো পায়ের ছাপের স্পর্শ পাই, সেই সঙ্গে খুঁজতে থাকি আমার আলতাপরা বৌকে |"

ডেকের নোনা বাতাস, জিন এন্ড টনিকের মৃদু নেশা আর বুকভাঙা ঘরভাঙার গল্প শুনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে রইলাম | তবে আজ আর সূর্যাস্ত তেমন রঙিন লাগল না |

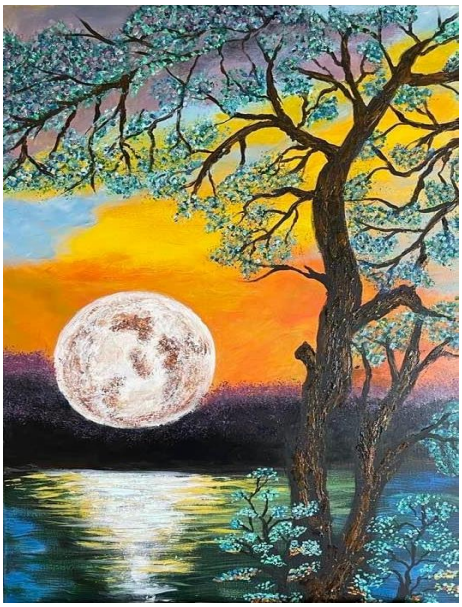

শিল্পী: সফিক আহমেদ

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩০ (2023)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word**-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর এক মাস আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

“নব আনন্দে জাগো, আজি নব রবিকিরণে”

শুভ নতুন বছর